পুরুষার্থ প্রসঙ্গঃ
পাশ্চাত্য বনাম ভারতীয় ভাবধারা

ডক্টর রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

লেখক-পরিচিতি

ডক্টর রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বিভাগের একজন কৃতী অধ্যাপক এবং কলিকাতার বিদ্যাসাগর কলেজ ও নরেন্দ্রপুরস্থ রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়ের একজন কৃতী প্রাক্তন ছাত্র। পদার্থবিদ্যার ছাত্র ও গবেষক হওয়া সত্ত্বেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন, বিশেষ করে হিন্দু শাস্ত্র, বেদ, বেদান্ত ও উপনিষদাদির দর্শন, হিন্দু সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ, পাণ্ডিত্য ও উপলব্ধি তাঁর বিভিন্ন রচনায় প্রতিফলিত হচ্ছে।

পুরুষার্থ প্রসঙ্গ ঃ
পাশ্চাত্য বনাম ভারতীয় ভাবধারা

ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

তুহিনা প্রকাশনী

Purusartha Prasanga : Paschatya Banam Bharatia Bhavdhara
by
Dr. Radhasyam Brahmachari

প্রকাশক
গীতিকা মাইতি
তুহিনা প্রকাশনী, ৩০/৬/২এ, মদন মিত্র লেন, কলকাতা - ৭০০০০৬,
ফোন ঃ ০৩৩ ২৩৬০ ৪৩০৬, ই-মেল ঃ mahamayapress@gmail.com

তৃতীয় প্রকাশ ঃ কলকাতা বইমেলা, ২০১৬

মূল্য ঃ ৫০.০০ টাকা

বর্ণ সংস্থাপন এবং মুদ্রণে
মহামায়া প্রেস এন্ড বাইন্ডিং, ২৩, মদন মিত্র লেন, কলকাতা - ৭০০০০৬

প্রাপ্তিস্থান
তুহিনা প্রকাশনী, ১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩, ফোন ঃ ০৩৩ ২৩৬০ ৪৩০৬

মত্তসিংহ জিনি কত তরঙ্গ প্রভুর।
দেখিতে সবার হর্ষ বাড়য়ে প্রচুর।।
সর্ব্বলোকচূড়ামণি প্রভু বিশ্বম্ভর।
আইলা নাচিয়া যেথা কাজীর নগর।।
শুনিয়া কাম্পিত কাজী গণসহ ধায়।
সর্পভয়ে যেন ভেক ইন্দুর পলায়।।
আসিয়া কাজীর দ্বারে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রোধাবেশে হুঙ্কার করয়ে বহুতর।।
ক্রোধে বলে প্রভু—আরে কাজী বেটা কোথা।
ঝাট আন ধরিয়া কাটিয়া ফেল মাথা।।
নির্যবন করোঁ আজি সকল ভুবন।
পূর্ব্বে যেন বধ কৈলুঁ সে কালযবন।।
প্রাণ লঞা কোথা কাজী গেল দিয়া দ্বার।
ঘর ভাঙ্গ ভাঙ্গ প্রভু বলে বার বার।।
ভাঙ্গিলেন যত সব বাহিরের ঘর।
প্রভু বলে অগ্নি দেহ বাড়ীর ভিতর।।
পুড়িয়া মরুক সব গণের সহিতে।
সর্ব্ববাড়ী বেড়ি অগ্নি দেহ চারিভিতে।।
অগ্নি দেহ ঘরে সব না করিহ ভয়।
অজি সব যবনের করিমু প্রলয়।।

মুসলীম পরাধীনতার বিরুদ্ধে সিংহনাদকারী "উন্নতনাসিকা সিংহগ্রীব মনোহর। সবা হৈতে সুপীত সুদীর্ঘ কলেবর।।" সেই শচী-নন্দন শ্রীমন্মহাপ্রভুর রাতুল চরণ এই অধম লেখকের একমাত্র পাথেয় ও প্রেরণা।

পরমারাধ্যা মাতৃদেবীর চরণে এই গ্রন্থ নিবেদিত হল—লেখক।

লেখকের কথা

বছর তিনেক আগে আমার কয়েকজন সুহৃদ প্রাচীন ভারতীয় অর্থনীতি বা "হিন্দু অর্থনীতি"র উপর একখানা সহজবোধ্য পুস্তক রচনা করতে বলেন আমাকে। বিষয়টা আমাকেও প্রলুব্ধ করে এবং বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করতে শুরু করে দিই। ঐ সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করার পর আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব হয় যে, বর্তমানে পাশ্চাত্য-অর্থনীতির যে পঠন-পাঠন আমাদের দেশে প্রচলিত রয়েছে তার সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় অর্থনীতির মূলগত এবং আকাশপ্রমাণ প্রভেদ বিদ্যমান। পাশ্চাত্য অর্থনীতির লক্ষ্য হল মুষ্টিমেয় কিছু লোকের তাৎক্ষণিক সুখ-সুবিধার বিধান করা, সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণের কথা তাতে নেই। পক্ষান্তরে হিন্দু অর্থনীতির লক্ষ্য হল উচ্চনীচ নির্বিশেষে সমগ্র মানব সমাজের দীর্ঘস্থায়ী আর্থিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধন করা। পাশ্চাত্য অর্থনীতির লক্ষ্য হল অভাব সৃষ্টি করা এবং তা টিকিয়ে রাখা, কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতির মূল লক্ষ্য হল প্রাচুর্য সৃষ্টি করা। উপরন্তু আমার পক্ষে এটাও বোঝা সম্ভব হল যে, পাশ্চাত্য ও ভারতীয় অর্থনীতির মধ্যেকার প্রভেদগুলো পাশ্চাত্য ও ভারতীয় দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে নিহিত রয়েছে।

ফলে আমার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হল যে, পাশ্চাত্য ও ভারতীয় জীবন দর্শনের মৌলিক বিভেদগুলো জানা না থাকলে পাঠকের পক্ষে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় অর্থনীতির বিভেদগুলোও বোঝা সম্ভব নয়। উপরন্তু ভারতীয় মতে অর্থনীতি শাস্ত্র বা বার্তা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চার পুরুষার্থের মধ্যে অর্থ পুরুষার্থের অন্তর্গত। কাজেই চার পুরুষার্থ বলতে কি বোঝায় এবং ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে তাদের উদ্দেশ্যই বা কি, ইত্যাদি বিষয়গুলো জানা না থাকলে ভারতীয় অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্যগুলোকেও পাঠকের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে উঠবে না।

উপরিউক্ত কারণগুলির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় সংস্কৃতির মূল প্রভেদগুলি পাঠকের সামনে খুব অল্প পরিসরে তুলে ধরার উদ্দেশ্য নিয়ে এই পুস্তকটির রচনার কাজে প্রবৃত্ত হই। প্রস্তাবিত হিন্দু অর্থনীতি শীর্ষক গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় হিসাবেই লেখা শুরু করি। কিন্তু পাণ্ডুলিপিটি দেখে আমার কয়েকজন সুহৃদ, বিশেষ করে যাদবপুরস্থিত শ্রীসত্যানন্দ দেবায়তনের স্বামী মৃগানন্দ মহারাজ এটিকে পৃথক গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। উপরন্তু তিনি স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে গ্রন্থরশ্মির উপদেষ্টা শ্রী বিশ্বনাথ মজুমদার মহশয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন।

যাই হোক, বিশ্বনাথবাবুর ঐকান্তিক সহযোগিতায় শেষ পর্যন্ত পুস্তকটির প্রকাশ সম্ভব হল। এটি পাঠ করে যদি ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মূল প্রভেদগুলি পাঠকের বোধগম্য হয় তবেই আমার প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

সূচীপত্র

পাশ্চাত্যের সভ্যতা কি সভ্যতা, না অসভ্যতা?

পাশ্চাত্য জগতের বর্তমান আর্থিক সমৃদ্ধি, যান্ত্রিক বিজ্ঞানে তাদের দক্ষতা, বিশ্বরাজনীতিতে তাদের প্রভাব ও প্রাধান্য লক্ষ্য করে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ তো বটেই, এমনকি তথাকথিত মহা মহা পণ্ডিতরাও এই মত ব্যক্ত করেন যে, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ভারতকে শক্তিশালী করতে হলে পাশ্চাত্য ভাবধারার অনুকরণ করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। কাজেই নিজস্ব ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সবকিছু বিসর্জন দিয়ে অন্ধভাবে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করতে হবে। বর্তমানে, বিশেষ করে ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার পর থেকে এই ঝোঁকটা খুবই বেড়ে চলেছে এবং এর ফলেই শিশুদের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করার ভিড় ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। "আমরা বৃটিশ রাজত্বকালে বিদেশী বস্তু বর্জন করিয়াছি, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বৃটিশ-শাসন অবসানের পর তাহাদের অন্ধ অনুকরণই যেন অগ্রগতির প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।"(১) "আসল অসুবিধা হয়, যখন আমরা পাশ্চাত্য জাতিগুলির অগ্রগতি ও তাহার ফলাফল বিচারে অক্ষম হই। ... পাশ্চাত্যের প্রতিনিধিরূপে বৃটিশরা এই দেশ দুইশত বৎসর শাসন করিয়াছে এবং এই সময় তাহারা এমন সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে যাহাতে জনমনে ভারতীয় সকল আদর্শের প্রতি উপেক্ষা ও পাশ্চাত্যের সব কিছুর প্রতি শ্রদ্ধার ভাব জাগ্রত হয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাহাদের জীবনযাপন প্রণালী, আচার-আচরণ, খাদ্যাভ্যাস প্রভৃতিও গ্রহণ করিয়াছি।"(২)

কিন্তু পৃথিবীর কোন একটি এলাকায় বা কোন একটি দেশে যদি গুণ্ডার রাজত্ব কায়েম হয় এবং সেই গুণ্ডারা যদি লুণ্ঠন, ডাকাতি ইত্যাদির মাধ্যমে বড়লোক হয় তবে তাদের দেখাদেখি অন্য সবাইকেও গুণ্ডা বা ডাকাত হতে হবে এবং লুণ্ঠনের দ্বারা বড়লোক হতে হবে, এটা কখনও সমাধান হতে পারে না। আমাদের সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, পাশ্চাত্যের বর্তমান সমৃদ্ধির মূল উৎস হল পরপীড়ন ও লুণ্ঠন। এ কথা সকলেরই জানা আছে যে, ভারতকে লুণ্ঠন করেই বৃটিশ পৃথিবীব্যাপী তার সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল। এই লুণ্ঠন ও অত্যাচার এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে বৃটিশ পার্লামেন্ট ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংসের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব নিতে বাধ্য হয়

---

(১) একাত্ম মানববাদ, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, পৃ: ১১।
(২) ঐ, পৃ: ৯।

এবং আত্মমর্যাদা রক্ষার্থে ক্লাইভকে আত্মহত্যা করতে হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ঐতিহাসিক H.G. Wells লিখেছেন, "It (the East India Company) had come to buy and sell, and it found itself achieving a tremendous piracy. There was no one to challenge its proceedings. Is it any wonder that its captains and commanders and officials, nay, even its clerks and common soldiers, came back to England loaded with spoils? ... Englishmen at home were perplexed when presently these generals and officials came to make dark accusations against each other of extortions and cruelties. ...To the bulk of English people India was a remote, fantastic, almost inaccessible land, to which adventurous poor young men went out, to return after many years very rich and very choleric old gentlemen".[৩]

আমেরিকা মহাদেশে বসতি স্থাপন করার পর সেখানকার আদিম অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানও মায়া জাতির লোকদের নির্মমভাবে হত্যা করে, নিশ্চিহ্ন করে, তাদের জমি-জায়গা আত্মসাৎ করার মধ্য দিয়ে আমেরিকার বর্তমান সমৃদ্ধির সূত্রপাত হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়া, নিউ জীল্যাণ্ড এবং বিভিন্ন প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপে বর্তমান ইংরাজ বসতি স্থাপনকারীদের ক্ষেত্রেও এ কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। ফরাসী, বেলজিয়ান, ইংরাজ প্রভৃতি ইয়োরোপের সুসভ্য জাতি আফ্রিকার অধিবাসীদের উপর যে নির্মম অত্যাচার ও লুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে আজ নিজেরা বড়লোক হয়েছে তা পশুসমাজকেও হার মানায়। কয়েকটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। বেলজিয়ানরা কঙ্গোর খনিতে শাস্তি হিসাবে শ্রমিকদের আঙ্গুল কেটে দিত এবং অন্যান্য শ্রমিকরা যাতে ভয় পায় সেই জন্য সেই সব কাটা আঙ্গুল মালা গেঁথে ঝুলিয়ে রাখত।[৪] আমেরিকার বাজারে নিগ্রো দাস বিক্রি করা তখন একটা লাভজনক ব্যবসা ছিল তাই এই ব্যবসা বৃটিশ সরকার নিজেই করত। প্রথমে একটা গ্রামকে রাতের অন্ধকারে ঘিরে ফেলা হত এবং কর্মক্ষমদের পায়ে শিকল বেঁধে জাহাজে তোলা হত। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ডঃ অতুলচন্দ্র রায় লিখেছেন, "ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত দাস ব্যবসা অব্যাহত থাকে। লক্ষ লক্ষ

(৩) A Short History of the World (Penguin), p. 243.

(৪) উৎসাহী পাঠক শ্রী সৌরীণ সেনের "কঙ্গো থেকে ফেরা" দেখতে পারেন।

আফ্রিকান উহাদের বাসভূমি হইতে উৎখাত হইয়া যায় এবং ইয়োরোপীয়দের আক্রমণে লক্ষ লক্ষ প্রাণ হারায়"।[৫] তাই স্বামীজি লিখেছেন, "তুমি ইয়োরোপী, কোন দেশকে কবে ভাল করেছ? অপেক্ষাকৃত অবনত জাতিকে তোলবার তোমার শক্তি কোথায়? যেখানে দুর্বল জাতি পেয়েছ, তাদের সমূলে উৎখাত করেছ। যাদের জমিতে তোমরা বাস করছ, তারা একেবারে বিনষ্ট হয়ে গেছে। তোমাদের আমেরিকার ইতিহাস কি? তোমাদের অস্ট্রেলিয়া, নিউ জীল্যাণ্ড, প্যাসিফিক দ্বীপপুঞ্জ— তোমাদের আফ্রিকা। ... কোথায় সে সব বুনো জাত আজ? একেবারে নিপাত— বন্যপশুবৎ তাদের তোমরা মেরে ফেলেছ; যেখানে তোমাদের শক্তি নাই সেথা মাত্র অন্য জাত জীবিত। ... ইয়োরোপের উদ্দেশ্য সকলকে নাশ করে আমরা বেঁচে থাকব"।[৬]

এই অত্যাচার ও নিপীড়ন যে শুধু অন্য দেশের বা অন্য জাতির লোকদের প্রতিই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, গ্রীক ও রোমান আমলে জঘন্য ক্রীতদাস প্রথা ও পরবর্তীকালের ভূমিদাস প্রথাও পরপীড়নের মাধ্যমে সম্পদশালী হবার নগ্ন প্রকাশ মাত্র। দার্শনিক Locke এর মতে, "Captives in a just war are slaves by the Law of Nature."[৭]। ঐ সময় গ্রীসে ক্রীতদাসদের বিয়ে করা বা ঘর সংসার করার কোন অধিকার ছিল না। রাত্রিতে তাদের শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হত এবং মাথার অর্ধেক চুল কামিয়ে দেওয়া হত। তা সত্ত্বেও কোন ক্রীতদাস পালিয়ে গেলে তার সঙ্গীসাথী সবাইকে হত্যা করা হত। বছরে একদিন ক্রীতদাস নিধন যজ্ঞ হত। ঐ দিন অবাধ্য ও অক্ষম ক্রীতদাসদের নির্বিচারে হত্যা করা হত। এজন্য তাদের কোন অপরাধবোধ ছিল না কারণ তাদের দেবদেবীরাও এই রকম আচরণ করত। দার্শনিক Aristotleকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কোন ক্রীতদাসের সঙ্গে তিনি বন্ধুত্ব করতে রাজি আছেন কিনা। জবাবে তিনি বললেন যে, ক্রীতদাস তো একটা যন্ত্র বিশেষ, জীবন্ত যন্ত্র, তাই যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের বন্ধুত্ব কখনই সম্ভব নয়।

উদগ্র কামনা ও নির্লজ্জ স্বার্থপরতা দ্বারা চালিত হয়ে এই সব সুসভ্য জাতি বিগত দুটো বিশ্বযুদ্ধে যে হানাহানি মারামারি করেছে, জার্মান নাৎসী বাহিনী যে ইহুদী

---

(৫) আধুনিক ইয়োরোপের ইতিহাস, পৃ: ৪০৪।

(৬) বিবেকানন্দ রচনাবলী, উদ্বোধন, (বিবেকানন্দ জন্ম শতবর্ষ প্রকাশন) ৬ খণ্ড, পৃ: ২১১।

(৭) History of Western Philosophy, Bertrand Russel. পৃ: ৬০৪।

নিধন যজ্ঞ চালিয়েছে, তাতে আর যাই হোক তারা যে সুসভ্য তা প্রমাণ হয়নি। এই উদগ্র কামনার দ্বারা চালিত হয়েই এই সব অসভ্যের দল নির্বিচারে প্রকৃতিকে লুণ্ঠন করে পৃথিবীকে মনুষ্যবাসের অযোগ্য করে তুলেছে। এদের অত্যাচারে বহু জীবজন্তু আজ পৃথিবীর মাটি থেকে চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেছে। ইয়োরোপীয়রা যখন আমেরিকায় যায় তখন সেখানকার আকাশে একধরনের জংলী পায়রা উড়ে বেড়াত যা গুনে শেষ করার উপায় ছিল না। কিন্তু এদের অত্যাচারে সেই পায়রা আজ লুপ্ত। অনেকদিন আগে শিকাগোর সিনসিনাটি চিড়িয়াখানায় শেষ একজোড়া পায়রা মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রজাতির পায়রা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এদের অত্যাচারে তিমি মাছ ও হাঙর আজ বিলুপ্তির পথে। সেই সঙ্গে সঙ্গে কত প্রজাতির জীবজন্তু যে চিরবিদায়ের অপেক্ষায় রয়েছে তা বলা শক্ত। এককালে মাদাগাস্কার দ্বীপে উড়তে অক্ষম ডোডো নামে এক ধরনের বিশালকায় পাখি ছিল। অনেকের ধারণা সেই পাখির আকার থেকে সিন্ধবাদের গল্পের লেখক রক পাখীর কল্পনা করেছিলেন। ইয়োরোপীয়রা ঐ দ্বীপে পৌছানোর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সেই সর্বাপেক্ষা বিশালকায় পাখীর অস্তিত্ব চিরকালের মত মুছে যায়। এই সমস্ত বর্বরদের ধর্মীয় মতবাদ তাদের এই সব জঘন্য কাজের পিছনে মদৎ যুগিয়ে আসছে। কারণ বাইবেলের গড পৃথিবীর সমস্ত গাছপালা ও জীবজন্তুর উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব দিয়ে প্রথমে আদমকে পৃথিবীতে পাঠালেন(৮)। পরে মহাপ্লাবনের পর তিনি নোয়াকে সবকিছু নির্বিচারে হত্যা করার অনুমতি দিয়ে বললেন, "The fear and dread of you will fall upon all the beasts of the earth and all the birds of the air, upon every creature that moves along the ground, and upon all the fish of the sea; they are given into your hands. Everything that lives and moves, will be food for you. Just as I gave you the green plants, I now give you everything".(৯)। অথচ এই, "পশুভাবাপন্ন জগতে আজ পাপেরই জয়জয়কার আর পুণ্যের সর্বদা নির্যাতন"(১০)। কিন্তু পশুভাবাপন্ন পাশ্চাত্য সভ্যতার এই জয়জয়কার উদার ভারতীয় সভ্যতার দৈন্য সূচিত করে না। পশুত্বের বর্তমান জয়জয়কার ভারতীয় সংস্কৃতির লজ্জা নয় বরং শুধু পাশ্চাত্য জগতেরই

---

(৮) Geneis, (1/28)।
(৯) ঐ, (9/2,3)।
(১০) বিবেকানন্দ রচনাবলী, ঐ, ৬ খণ্ড, পৃ: ২১১।

লজ্জা। সত্যেন বসু বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ পাননি তা সত্যেন বসুর লজ্জা নয়, নোবেল কমিটিরই লজ্জা।

এই নির্লজ্জ স্বার্থপরতা ও লুণ্ঠনের ধারা অনুসরণ করেই আজকের "ডাঙ্কেল" বা "গ্যাট" চুক্তির উদ্ভব। আজ পৃথিবী অনেক ছোট হয়ে গেছে, পরিস্থিতি বদলে গেছে। তাই এককালে আমাদের দেশে নীলকর সাহেবরা যে অত্যাচার চালিয়েছিল বা আফ্রিকাকে টুকরো টুকরো করে যে অত্যাচার চালানো হয়েছিল আজ তার পুনরাবৃত্তি করা সম্ভব নয়। তাই অর্থনৈতিক প্রাধান্য, অসম বাণিজ্য চুক্তি, বৈদেশিক ঋণ, বৌদ্ধিক সম্পত্তির মালিকানা ইত্যাদির মাধ্যমে লুণ্ঠনের ভদ্রস্থ কায়দা বার করতে হয়েছে। হাতকড়া লাগিয়ে গোলাম বানাবার যুগ শেষ হয়ে গেছে, তাই আর্থিক দিক দিয়ে গোলাম বানাবার কায়দা বার করতে হয়েছে। মূল উদ্দেশ্য সেই একই—পরপীড়ন ও লুণ্ঠন। "সকলকে নাশ করে আমরা বেঁচে থাকব।"(১১) "গ্যাট" চুক্তির প্রবক্তারা তো বটেই, সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মানুষ আজ জোর গলায় প্রচার করে চলেছেন যে, এই গ্যাট চুক্তি একটা খুবই নিষ্পাপ প্রচেষ্টা। এর দ্বারা গরীব দেশ, ধনী দেশ, সবাই সমান ভাবে, স্বাধীন ভাবে বাণিজ্য করার সুযোগ পাবে। পৃথিবীর সমস্ত দেশগুলির মধ্যে একটা নিবিড় বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হবে। কিন্তু একটা নেকড়ে বাঘ কোন মেষশাবকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে আগ্রহ প্রকাশ করলে, মনে সন্দেহ জাগাই স্বাভাবিক। আজ থেকে বহু বছর আগে স্বামীজি এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, "যখন তুমি কোথাও এই ভাবের (সর্বজনীন ভ্রাতৃভাব ও সাম্যের) কথা শুনিবে, তখনই আমার অনুরোধ, একটু ধীর এবং সতর্ক হইবে। কারণ এই সকল কথাবার্তার অন্তরালে প্রায়ই ঘোর স্বার্থপরতা লুকাইয়া থাকে।"(১২)

কিন্তু লুণ্ঠনের দ্বারা সকলে লাভবান হতে পারে না। যারা লুণ্ঠন করে তারাই লাভবান হয় আর যারা লুণ্ঠিত হয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটাই স্বতঃসিদ্ধ। অতীতেও এটাই ঘটেছে এবং ভবিষ্যতেও এটাই ঘটবে। কাজেই পাশ্চাত্য ভাবধারা অনুকরণ করে লাভবান হতে গেলে আমাদেরও পরপীড়ন ও লুণ্ঠনে হাত পাকাতে হবে, হানাহানি মারামারিতে পটু হতে হবে এবং 'সবাই সুখী হোক' এই ঋষিবাক্য ও

(১১) বিবেকানন্দ রচনাবলী, ৭ খণ্ড, পৃ: ৩৩১।

(১২) ঐ, উদ্বোধন, (বিবেকানন্দ জন্ম শতবর্ষ প্রকাশন) ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫৫।

দৃষ্টিভঙ্গী বর্জন করতে হবে। পাশ্চাত্যের দর্শন, "Survival of the fittest" বা "জোর যার মুলুক তার" এই জঙ্গলের নীতি গ্রহণ করতে হবে এবং ইয়োরোপীয়দের মত সর্বপ্রথম নিজেদের মধ্যে স্বার্থের হানাহানি শুরু করে দিতে হবে। কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষ কোনদিন পাশ্চাত্যের এই সুসভ্য ভাবধারা পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারবে কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে; কারণ ভারতের কোন ঋষি বা দার্শনিক পাশ্চাত্যের মহান দার্শনিক অ্যারিস্টটলের মত এই মত ব্যক্ত করে যাননি যে, "Man is a social animal" বা মানুষ একটি সমাজবদ্ধ পশুমাত্র। পক্ষান্তরে ভারতের ঋষি উদাত্ত কণ্ঠে সমগ্র মানবজাতিকে একথাই শুনিয়ে গেছেন যে, "মানুষ তুমি অমৃতের পুত্র।" "বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের বিকাশ ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান আদর্শ। ... সংঘর্ষ প্রকৃতির ও সংস্কৃতির লক্ষণ নহে, ইহা বরং তাহার অবনতির কারণ। ... আমরা লোভ, ক্রোধ ইত্যাদিকে (ছয়টি নীচ প্রবৃত্তিকে) মানুষের অবনতির কারণ বলিয়া মনে করি। আমরা এগুলিকে সভ্য জীবন বা সংস্কৃতির মান হিসাবে কখনই গ্রহণ করি নাই। সমাজে দস্যু, তস্কর অবশ্যই আছে। ... কিন্তু ইহাদেরই সমাজের আদর্শ হিসাবে কখনই মনে করিতে পারি না।"(১৩)

কিন্তু, পাশ্চাত্য জীবন দর্শন এর সম্পূর্ণ বিপরীত। খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় সাড়ে চারশ বছর আগে গ্রীক দার্শনিক এম্পিড্‌কল্‌স প্রথম survival of the fittest - এর তত্ত্ব আবিষ্কার করেন এবং তৎকালীন ক্রীতদাস সমাজ ব্যবস্থার স্বার্থে অ্যারিস্টটল, প্লেটো ইত্যাদি পরবর্তী দার্শনিকগণ এই তত্ত্বকেই জীবনযাত্রার নীতি হিসাবে গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালের (১৭শ শতাব্দী) জার্মান দার্শনিক, লিবনিৎসের মতে এই পৃথিবীটা একটা যুদ্ধক্ষেত্র বিশেষ। যারা টিকে থাকার উপযুক্ত (Compossible) তারা এক দলভুক্ত এবং যারা টিকে থাকার উপযুক্ত নয় তারা দ্বিতীয় দলভুক্ত। এই দুই দলের মধ্যে নিরন্তর সংঘর্ষ চলছে এবং টিকে থাকার এই লড়াইয়ে দ্বিতীয় দল পর্যুদস্ত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে।(১৪) লিবনিৎসের এই তত্ত্বকে অবলম্বন করেই পরবর্তীকালে ডারউইন তার "Origin of Specis"-এর তত্ত্ব এবং মার্ক্স তাঁর সংঘর্ষমূলক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব খাড়া করেন। কিন্তু আমাদের মতে,

(১৩) একাত্ম মানববাদ, পৃ: ২৪।
(১৪) Hist. Western Philosophy. p. 574.

"Survival of the fittest বা জোর যার মুলুক তার, ইহা অরণ্যের নীতি। সভ্যতা এই নীতির উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া ওঠে নাই। বরং মানুষের জীবনে এই নীতি যত কম প্রযুক্ত হয় তাহারই চেষ্টা হইয়াছে।"

ভারতবর্ষ নৃতত্ত্ববিদদের স্বর্গ, কারণ ভারতে যত রকমের জাতি-প্রজাতির মানুষ দেখতে পাওয়া যায়, পৃথিবীর আর কোথাও তা সম্ভব হয় না। এর কারণ কি? কারণ ভারতবর্ষ কোনদিন লিবনিৎসের তত্ত্বের মত কোন তত্ত্বকে জীবনযাত্রার আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেনি। এই কারণেই এই দেশের মাটিতে ইয়োরোপের মত জঘন্য ক্রীতদাস প্রথা বা ভূমিদাস প্রথা জন্মলাভ করতে পারেনি। এই কারণেই ভারতের কোন এক প্রজাতির মানুষ কোনদিন হানাহানি মারামারি করে, স্বার্থের খাতিরে অন্য কোন দুর্বল প্রজাতির মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেনি। ইয়োরোপীয় ভাবধারা গ্রহণ করলে ভারতের মাটি থেকে বহুকাল আগেই বহু দুর্বল প্রজাতির মানুষ চিরতরে লুপ্ত হয়ে যেত।

"ভ্রাতা-ভগ্নী, মাতা-পুত্র ও পিতার সম্পর্ক স্বাভাবিক। ইহা মানুষ ও জন্তু-জানোয়ার সকলের মধ্যেই বিদ্যমান। জন্তুদের স্মৃতিশক্তিহীনতার জন্যে এ সম্পর্ক ক্ষণস্থায়ী।"(১৫) ভারতবর্ষের মানুষ পাশ্চাত্য ভাবধারা গ্রহণ করলে কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যাবে যে পশুদের মত আমাদের ছেলেমেয়েরাও বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে বাবা-মার সংশ্রব ত্যাগ করছে। বৃদ্ধ বাবা-মা জঞ্জালের মতই পরিত্যক্ত হয়ে বৃদ্ধাবাসে দিন কাটাচ্ছেন। ভারতবর্ষ শিক্ষা দিয়েছে

আচার্যো ব্রহ্মণো মূর্তিঃ পিতা মূর্তিঃ প্রজাপতেঃ।
মাতা পৃথিব্যা মূর্তিস্তু ভ্রাতা স্বো মূর্তিরাত্মনঃ।।

অর্থাৎ, "বেদদাতা আচার্য ব্রহ্মের সাক্ষাৎ মূর্তি, জন্মদাতা পিতা প্রজাপতি ব্রহ্মার মূর্তি, গর্ভধারিণী মাতা পৃথিবীর সাক্ষাৎ মূর্তি এবং সহোদর ভ্রাতা আপনার দ্বিতীয় মূর্তি। অপত্য জননে পিতামাতা যে ক্লেশ স্বীকার করেন, পুত্র শত শত বর্ষেও তা পরিশোধ করতে পারে না। পিতা, মাতা ও আচার্য, এই তিনজন প্রসন্ন থাকিলে সমুদায় তপস্যা সম্পন্ন হয়।"(১৬) কিন্তু পবিত্র বাইবেল বলছে যে, যেহেতু আদমের

(১৫) একাত্ম মানববাদ - পৃ: ২৫।
(১৬) মনুসংহিতা - (২/২২৫,২২৭,২২৮)।

বুকের পাঁজর থেকে ঈভের সৃষ্টি তাই মানুষ বাবা-মাকে পরিত্যাগ করে পত্নীর সঙ্গে মিলিত হবে। গড বলেছেন, "For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh."[১৭]। ভারতের শাস্ত্রকার বলেছেন যে পিতার বংশের অধঃস্তন চৌদ্দ (অথবা সাত) এবং মাতার বংশের অধঃস্তন চৌদ্দ (বা পাঁচ) পুরুষের বিবাহ করতে নেই[১৮]। কাজেই যে গ্রন্থে মহান আব্রাহাম (কোরানের ইব্রাহীম)-এর ভাই নাহর ছোট ভাই হারনের মেয়ে মিলকাকে বিয়ে করে অথবা মহান লত (কোরানে লুত) নিজ ঔরষজাত দুই কন্যার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করে[১৯], সেই গ্রন্থকে পবিত্র গ্রন্থ রূপে মেনে নিতে একজন ভারতবাসীর অসুবিধা হবারই কথা। যে পবিত্র গ্রন্থ বলে, "Do not dishonour your father by having sexual relations with your mother" অথবা "Do not have sexual relations with your father's wife; that would dishonour your father" (Leviticus 18/7,8), বর্বরদের দ্বারা বর্বরদের জন্য রচিত সেই গ্রন্থকে ভারতবর্ষের মানুষ কোন দিনও পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে বলে মনে হয় না। কারও বাবা মারা গেলে বা নিরুদ্দেশ হলে এই বর্বরদের ঈশ্বর কি বিধান দেবেন সেটাও বিবেচনার বিষয়।

যে কেউ ঐ পবিত্র গ্রন্থ অধ্যয়ন করার চেষ্টা করলেই দেখতে পাবেন সেই মহান গ্রন্থের তৃতীয় পৃষ্ঠাতেই এক ভাই ঈর্ষাকাতর হয়ে তার সহোদর ভাইকে হত্যা করছে।[২০] আর একটু অগ্রসর হলেই দেখা যাবে যে সুন্দরী মানবীদের সঙ্গে যৌনক্রিয়া করার জন্য গডের পুত্ররা দলে দলে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসছে এবং গৌরবময় পুত্র উৎপাদন করছে[২১]। মহান নোয়া মত্ত অবস্থায় নগ্ন হয়ে শুয়ে আছেন এবং সেই নগ্নতা দেখার দোষে পৌত্র কানানকে ক্রীতদাস হবার অভিশাপ দিচ্ছেন।[২২] গড মানুষকে হত্যার বদলে হত্যার উপদেশ দিচ্ছেন[২৩] এবং প্রতিজ্ঞা করছেন যে, শিশুকাল থেকেই মানুষের হৃদয় পাপ ও কুকর্মের প্রতি ঝুঁকে থাকা সত্ত্বেও তিনি মানুষকে আর অভিশাপ দেবেন না।[২৪] কাজেই এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, এই পবিত্র গ্রন্থ যে যত অধিকবার পাঠ করবে তত দ্রুতগতিতে তার

---

(১৭) Genesis - (২/২৪)। (১৮) মনুসংহিতা - (৩/৫); যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা - (১/৫৩)।
(১৯) Genesis - (১১/২৯, ১৯/৩৬, ৩৭)। (২০) Genesis - (৪/৮)।
(২১) Genesis - (৬/৪)। (২২) ঐ - (৯/১৮/২৭)। (২৩) ঐ - (৯/৬)। (২৪) ঐ - (৮/২১)।

নৈতিক অধঃপতন ঘটরে। এ সম্পর্কে দার্শনিক Locke-এর মত হল খ্রীস্টধর্ম মানুষের মধ্যে নৈতিক চেতনা জাগ্রত করতে ব্যর্থ হয়েছে। একমাত্র গডের শাস্তির ভয়েই মানুষ নৈতিকতা অবলম্বন করবে। কিন্তু কবে তিনি মানুষের অন্যায়ের শাস্তি দেবেন তার কোন ঠিক নেই। মানুষ মরে কবরে যাবে এবং তার কত হাজার বা কত লক্ষ বছর পরে গড সবাইকে কবর থেকে তুলে শেষবিচার করবেন এবং পাপের শাস্তি দেবেন তা কারও জানা নেই। কাজেই মানুষ সেই সুদূরপরাহত শাস্তির ভয়ে নৈতিক আচরণ না করে অর্থনৈতিক কাজের মাধ্যমে আশু সুখের ব্যবস্থা করবে এটাই স্বাভাবিক। কাজেই তাঁর মতে সব মানুষ যখন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুবই সাবধানী বা prudent হবে তখনই একমাত্র মানুষের মধ্যে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠিত হবে।[২৫] কাজেই এ কথা জোর দিয়ে স্বীকার করা চলে যে এই পবিত্র গ্রন্থকে অনুসরণ করার ফলেই আজকের পাশ্চাত্য জগতে প্রতি সেকেণ্ডে খুন, রাহাজানি ও ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে। আজ সেখানে স্কুলের কুমারী মেয়েরা শিশু সন্তানের জন্ম দিচ্ছে এবং যত শিশু জন্মাচ্ছে তার চল্লিশ শতাংশ পিতৃপরিচয়হীন। দুই থেকে আড়াই বছরের বেশি সেখানে কোন বিবাহ স্থায়ী হয় না এবং ক্রমাগত বিবাহ-বিচ্ছেদের ফলে বাবা-মার স্নেহ থেকে বঞ্চিত এক শ্রেণীর অত্যন্ত বেপরোয়া, উচ্ছৃঙ্খল ও অপরাধপ্রবণ নতুন প্রজন্মের আবির্ভাব ঘটছে। এই সব ছেলেরা পিস্তল পকেটে নিয়ে রাস্তায় ঘুরছে, ড্রাগ খাচ্ছে আর মেয়েরা বেশ্যাবৃত্তি করে টাকা রোজগার করছে। সম্প্রতি এই রকম দুইজন ছেলে ধরা পড়েছে যাদের মধ্যে একজন দশটা, আর একজন পনেরোটা খুনের অপরাধে অপরাধী।[২৬]

ভোগবাদী পাশ্চাত্য সমাজ দেহসর্বস্ব এবং দৈহিক সুখই সেখানে সুখের পরাকাষ্ঠা। অ্যারিস্টটলের মতে "happiness is good"। দার্শনিক Locke-এর মতে ভাল-মন্দ বিচারের মাপকাঠি হওয়া উচিত সুখ (pleasure) ও যন্ত্রণা (pain)। যা কিছু সুখ দেয় তাই উত্তম ও যা কিছু যন্ত্রণা বা কষ্ট দেয় তাই মন্দ।[২৭] প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্যের এই সুখ ও যন্ত্রণার উৎসও পবিত্র বাইবেল। কারণ তাতে আছে পুন্যাত্মাদের গড পুরস্কার হিসাবে স্বর্গের সুখভোগ দেবেন আর পাপীদের নরকের যন্ত্রণা দেবেন। কাজেই ঐ পবিত্র গ্রন্থ অনুসরণকারী কারও পক্ষেই দৈহিক সুখের

---

(২৫) Hist. West. Phil., p. 595. (২৬) The Telegraph - 5/12/93; Time - 4/4/94.
(২৭) Hist. West. Phil., p. 592.

উপরে আর কিছু চিন্তা করা সম্ভব নয়। তাই দার্শনিক Bentham-এর মত হল, pleasure-ই ভাল এবং pleasure বা happiness-ই মানুষকে নৈতিকতার পথে চালিত করতে পারে এবং গণতন্ত্রের উদ্দেশ্যই হল, "Greateast happiness of greatest numbers"।[২৮] ঠিক একই ভাবে J.S. Mill বলেন, "Pleasure is the only thing desired; therefore pleasure is the only thing desirable,"[২৯] কিন্তু মনে অশান্তি বা উৎকণ্ঠা থাকলে শুধু দৈহিক ভোগের উপকরণ মানুষকে সুখ দিতে পারে কি? একজন ফাঁসীর আসামীকে যতই ভাল খাদ্য-বস্ত্র দেওয়া হোক না কেন, তাতে সে সুখ পেতে পারে কি ? ভোগবাদী পাশ্চাত্য সমাজ মানুষের সুখের পরিমাপ করে কে কত টাকা উপার্জন করে তাই দিয়ে। কিন্তু এটা সুখের প্রকৃত মানদণ্ড কি ? যদি তাই হয় তবে একজন আমেরিকানের আয় আমাদের থেকে ৬৩ গুণ বেশি হওয়া সত্ত্বেও সেখানে মানসিক রোগীর সংখ্যা সর্বাধিক কেন? সেখানে আত্মহত্যা বা আত্মহত্যার প্রচেষ্টার ঘটনা সর্বাধিক কেন? সেখানকার মানুষ সবথেকে বেশি ঘুমের বড়ি খায় কেন এবং গভীর নিদ্রা সেখানকার একটা দুর্লভ বস্তু কেন? অন্ধকারে পথ হাতড়ে যে সত্য আবিষ্কার করতে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের আরও কয়েক শ বা কয়েক হাজার বছর লাগবে, বহু আগে ভারতের ঋষিরা সে সত্য আবিষ্কার করে বিশ্ববাসীকে শুনিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা বলে গিয়েছেন, "ভোগের মধ্যে সুখ নেই, ত্যাগেই সুখ," "ত্যাগাৎ সুখমনন্তরম্" বা "তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা"। তবে সুখের কথা হল পাশ্চাত্যে বরফ গলতে শুরু করেছে। ভোগের শেষ সীমায় পৌঁছে তাদের আজ চৈতন্য হচ্ছে যে, ভোগের দ্বারা কামনার শান্তি হয় না, বরং অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মতই তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই তারা লক্ষ লক্ষ ডলারের মায়া ত্যাগ করে মাথা মুড়িয়ে রাস্তায় রাস্তায় কীর্তন করতে লেগেছে। বাইবেল তাদের শান্তি দিতে পারেনি, ভারতের ত্যাগের মন্ত্রই তাদের শান্তি দিচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা প্রয়োজন। পাশ্চাত্যের ভোগবাদী দেহসর্বস্বতা তাদের শিল্পকলাতেও প্রতিফলিত। ভারতের শিল্পী যখন কোন দেবমূর্তি তৈরি করেন তিনি তা পার্থিব মানবদেহের আদলে কখনই করেন না। বিভিন্ন উপমা, যেমন কণ্ঠদেশ শঙ্খের মুখের মত, উরু কলাগাছের মত আঙ্গুল চাঁপা ফুলের মত ইত্যাদির

(২৮) Hist. West. Phil., p. 695. (২৯) Hist. West. Phil., p. 744.

সাহায্যে তার মধ্যে দেবভাব ফুটিয়ে তোলেন। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্যের যীশুর মূর্তি দেখলে মনে হয় যেন একজন muscleman কুস্তীগীরকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে। "পিতা", "ডেভিড" ইত্যাদি বিখ্যাত (?) ভাস্কর্যের বেলাতেও এই কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। ভাটিকানের দেওয়ালে ও ছাদে মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর বিশ্ববিখ্যাত (?) চিত্রকলাতেও নগ্ন muscleman-এর ছড়াছড়ি। আমাদের দেশের বুদ্ধের মূর্তি ও চিত্রকলা যখন গ্রীকদের হাতে পড়ে গান্ধার শিল্পের রূপ পেল তখন বুদ্ধের অন্তর্নিহিত ভাব গৌণ হয়ে পড়ল। বুদ্ধের দেহসৌষ্ঠব কাপড়ের ভাঁজ, মাথার চুল ইত্যাদিই প্রধান হয়ে দেখা দিল। এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় শরীরচর্চার ব্যাপারেও দু-একটা কথা বলা প্রয়োজন। পাশ্চাত্য শরীরচর্চা মানে শরীরেরই চর্চা। ডাম্বেল, বারবেল ও আরও নানারকম যন্ত্রপাতির সাহায্যে muscleman তৈরি করাই তার উদ্দেশ্য। মনের উপর এই শরীরচর্চা কোন প্রভাব ফেলে না। পক্ষান্তরে ভারতীয় ঋষিরা যোগাসনের মাধ্যমে যে শরীরচর্চা প্রবর্তিত করে গেছেন তার ফলে সুস্থ শরীরে দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায়ই এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তার ফলে চিত্তবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তিরও বিকাশ হয়। এই কারণেই ভারতীয় শরীরচর্চা পদ্ধতি ক্রমেই সারা বিশ্বে আদরণীয় হয়ে উঠছে এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরাও এ নিয়ে গবেষণা শুরু করে দিয়েছেন। হয়ত এমন দিনের আর বেশি বাকি নেই যেদিন ঋষি পতঞ্জলীর যোগসূত্র পৃথিবীর সমস্তগৃহে তার স্থান করে নেবে। কারণ কিছু কিছু লক্ষণ সেরকমই দেখা যাচ্ছে।

সমাজ ঃ পাশ্চাত্য ও ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

পাশ্চাত্য সমাজ মানুষকে বিচার করে অন্ধের হাতি দেখার মত। তাদের রীতি হল খণ্ডিত মানুষকে আংশিক বিচার করা। পূর্ণ মানুষকে বিচার করা তাদের সাধ্যে কুলায় না। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের কাছে মানুষ হল asking animal বা প্রশ্ন করতে সক্ষম এক প্রকার জন্তু বিশেষ। অ্যারিস্টটলের মতে মানুষ মূলত সমাজবদ্ধ পশু, তাই তার আচার-আচরণ নির্ধারিত হয় অন্তর্নিহিত পশুত্বের দ্বারা। অ্যাডাম স্মিথের মতে, মানুষ হল "অর্থনৈতিক মানুষ", তাই তার আচার-আচরণ নির্ধারিত হয় অর্থনৈতিক স্বার্থের দ্বারা। রাজনীতিকদের কাছে মানুষ হল "রাজনৈতিক মানুষ" এবং তার আচার-আচরণ নির্ধারিত হয় রাজনৈতিক স্বার্থের দ্বারা। মনস্তাত্ত্বিক ফ্রয়েডের মতে মানুষ হল যৌন কামনার বশীভূত পশু। তাই তার আচরণ নির্ধারিত হয় অন্তর্নিহিত ও সুপ্ত যৌন কামনার দ্বারা।

সমাজ কি, এবং সমাজের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ কি, এ নিয়েও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ আছে। অধিকাংশ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে সমাজের সংজ্ঞা হল, "Social beings men, express their nature by creating and re-creating an organisation, which guides and controls their behaviour in myriads of ways. This organisation, society, liberates and limits the activities of men, sets up standard for them to follow and maintain; whatever the imperfections and tyrannies it has exhibited in human history, it is a necessary condition of every fulfilment of life." [৩০] উপরিউক্ত সংজ্ঞা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সমাজ ক্লাব, সঙ্ঘ বা সমবায় সমিতির মত একটি সংগঠন যার অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে মানুষের ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা করলে সে সমাজ গঠন করতে নাও পারে কিংবা বর্তমান সমাজ ভেঙ্গে দিয়ে নতুন সমাজ সৃষ্টি করতে পারে। ব্যক্তিগত মানুষই মুখ্য, সমাজ গৌণ। ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা পুরণের জন্যই মানুষ সমাজ গঠন করে। এই কারণে ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষাই মুখ্য, সামাজিক বা সমষ্টিগত স্বার্থ গৌণ। এই সব কারণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে মানুষে মানুষে স্বার্থের সংঘাত, প্রতিযোগিতা ও হানাহানি অবশ্যম্ভাবী ও শাশ্বত সত্য। অসংখ্য ভাবে এই সংঘর্ষ আত্মপ্রকাশ করে এবং সময়ের সাথে সাথে তার রূপ এবং চরিত্রও বদলায়। যেখানে

---

(৩০) Society, R.M. MacIvar & C.H. Page, p. 5.

মনুষ্য সমাজ আছে সেখানেই মানুষে মানুষে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে কিংবা জাতিতে জাতিতে এই সংঘর্ষ ও সংঘাত আদিমকাল থেকেই চলে আসছে।

বাস্তব সত্য হল এই যে, যে সমাজ সভ্যতার যে পর্যায়ে রয়েছে সমাজ সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতাও সেই পর্যায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য। পাশ্চাত্য সমাজ এখনও নির্লজ্জ স্বার্থের হানাহানির উপরে উঠতে পারেনি, তাই তাদের অভিজ্ঞতা ও তাত্ত্বিক অলোচনার মধ্যে স্বার্থের হানাহানি, প্রতিযোগিতা ও survival of the fittest যে প্রাধান্য পাবে তাতে আর আশ্চর্য কি ? পিতৃসত্য রক্ষার্থে শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস গ্রহণ তাদের কাছে দুর্বোধ্য কিন্তু তিনভাইকে হত্যাকরে আওরঙজেবের সিংহাসন আরোহণ তাদের সহজ বোধ্য। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই তারা ভারতে আর্য আক্রমণের তত্ত্ব আমদানী করেছে, আর্যদের দ্বারা অনার্যদের এবং পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের দ্বারা শূদ্রদের নিপীড়নের তত্ত্ব প্রচার আরম্ভ করেছে। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই মার্ক্স তাঁর সংঘর্ষমূলক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব আমদানী করেছেন এবং তাকে অনুসরণ করে আমাদের দেশের মার্ক্সবাদীরা ভারতেও হানাহানি মারামারির আবিষ্কার করতে শুরু করেছেন। মার্ক্সের তত্ত্বের সপক্ষে ইতিহাসকে বিকৃত করার এক জঘন্য প্রচেষ্টা তাঁরা চালিয়ে যাচ্ছেন। সুসভ্য ভারতীয় সমাজকে বর্বর পাশ্চাত্য সমাজের পর্যায়ে নামিয়ে আনার চেষ্টার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে সমাজ ও সমাজভুক্ত মানুষের সম্পর্কে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী উপরোক্ত পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। "ব্যক্তি সমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এ ধারণা ভ্রান্ত। ... আমাদের মতে সমাজ সয়ম্ভুত। ব্যক্তির ন্যায় সমাজের গোষ্ঠীও প্রকৃতিগত। মানুষ সমাজ সৃষ্টি করে না! ... বাস্তবে সমাজ একটি আত্মসচেতন সত্তা।"(৩১) ভারতীয় মতে সমাজ টিকে থাকে সংঘর্ষের দ্বারা নয়, সহযোগিতার দ্বারা। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী সমাজের মানুষ পরস্পরের শত্রু নয়, সহযোগী ও সাহায্যকারী। ব্যক্তিগত সুখসুবিধা আদায় করার জন্য অপরকে নাশ করতে হবে, এটা ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী নয়, বরং অপরকে সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। সম্মুখ সংঘর্ষ এড়াবার জন্য এবং সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে সমাজকে কল্যাণকর দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যই ভারতীয় ঋষিরা বর্ণ বিভাগের সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁরা পাশ্চাত্যের socialistদের মত অযৌক্তিক ও অবাস্তব সাম্যের কথা বলেননি। পরম পুরুষের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে

(৩১) একাত্ম মানববাদ, পৃ: ৩৭

ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য ও পদদ্বয় থেকে শূদ্রের উৎপত্তি (৩২) এ ব্যাখ্যা এক বর্ণকে অপর বর্ণ থেকে হেয় করার উদ্দেশ্যে নয়। এর অর্থ হল, কোন অঙ্গহীন ব্যক্তি যেমন পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না তেমনি সমাজের কোন বর্ণ লোপ পেলে তা দুর্বল হলে সমাজও পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। তাই এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "ভারতবর্ষ বিশৃঙ্খলাকেও সম্বন্ধ বন্ধনে বাঁধার চেষ্টা করিয়াছে। যেখানে পার্থক্য আছে সেখানে পার্থক্যকে যথ যোগ্য স্থানে বিন্যস্ত করিয়া, সংযত করিয়া তবে তাহাকে ঐক্য দান করা সম্ভব হইয়াছে।"(৩৩) স্বামীজি লিখছেন, "প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ এত দূরদর্শী ছিলেন যে, তাঁহাদের জ্ঞানের মহত্ত্ব বুঝিতে জগৎকে এখনও কয়েক শতাব্দী অপেক্ষা করিতে হইবে"।(৩৪)

আমাদের দেশে এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁদের একমাত্র কাজই হল নিজের দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ছিদ্র অন্বেষণ করা। এঁরা নিজেদের খুবই উঁচুদরের পণ্ডিত বলে জাহির করেন এবং তথাকথিত বামপন্থী বা মার্ক্সবাদী পণ্ডিতগণ (?) এঁদের অগ্রগণ্য। এঁদের পাণ্ডিত্যের মানদণ্ড হল ভারতের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতিকে কত বেশী গালি দিতে পারেন। ভারতের হিন্দু সমাজের বর্ণভেদ বা জাতিভেদ প্রথাকে যত রকম ভাবে সম্ভব গালাগালি দিয়ে এঁরা আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। এঁরা আরও বলেন যে, উচ্চ বর্ণের লোকদের দ্বারা নিপীড়িত ও নিগৃহীত হয়েই হিন্দু সমাজের নিম্নবর্ণের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছে।

কিন্তু ইতিহাস অন্য কথা বলে। মিশর, ইরান, ইরাক ইত্যাদি যে সব দেশে শতকরা ১০০ ভাগ ইসলামীকরণ সম্ভব হয়েছে সেই সব দেশের সমাজে কোন জাতিভেদ প্রথা ছিল না। ইসলামীকরণের ফলে ঐ সব দেশের প্রাক্ ইসলামী প্রাচীন ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতা ধুয়ে মুছে লোপাট হয়ে গেছে। অথচ ভারতে অত্যন্ত নিন্দার্হ জাতিভেদপ্রথা এবং উচ্চবর্ণের দ্বারা নিম্নবর্ণের উপর তথাকথিত জঘন্য উৎপীড়ন সত্ত্বেও ইসলামের জয়ধ্বজা ভারতের মাটিতে এসে স্তব্ধ হয়ে গেল কেন? কেন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ৭০০ বছর রাজত্ব করেও বিদেশী মুসলমান শাসকরা মাত্র ১১ শতাংশ হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করতে সক্ষম হল? এ সকল প্রশ্নের জবাব উপরিউক্ত পণ্ডিতদের কাছে নেই। অথবা প্রকৃত জবাব জানা থাকলেও তাঁরা তা বলবেন না কারণ তাঁরা মিথ্যার বেসাতি করেন। প্রকৃত সত্য হল, জাতিভেদ প্রথাই ভারতে

(৩২) মনুসংহিতা - (১/৩১); ঋগ্বেদ - (১০/৯০/১২)। (৩৩) প্রবন্ধ - "ভারতবর্ষের ইতিহাস"। (৩৪) বিবেকানন্দ রচনাবলী - (৮/২১৩)।

শতকরা ১০০ ভাগ ইসলামীকরণের প্রচেষ্টাকেই ব্যর্থ করে দিয়েছে। এবং এই জাতিভেদ প্রথার জন্যই ভারতের হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি আজও টিকে আছে, মিশর, ব্যাবিলন, ইরাক বা ইরানের সভ্যতার মতো লোপাট হয়ে যায়নি।

এ ব্যাপারে আরও একটা লক্ষণীয় বিষয় হল, বিদেশী মুসলমান শাসকদের প্রধান কর্মক্ষেত্র ও রাজধানী ছিল দিল্লী। তাই দিল্লী ও তার আশেপাশের অঞ্চলেই ধর্মান্তরিত মুসলমানের সংখ্যা বেশী হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দিল্লী থেকে অনেক দূরে, সুদূর বাংলাদেশে ধর্মান্তরিত মুসলমানের সংখ্যা এত বেশী হল কি করে? এর মূলেও সেই জাতিভেদ প্রথা। বাংলার পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন এবং এইকারণে যখন ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম লুপ্ত হয়ে গেছে তখনও বাংলায় বৌদ্ধধর্ম টিকে ছিল। বাঙালী বৌদ্ধ ছাড়াও ঐ সময় বাংলার বাইরে থেকে অনেক বৌদ্ধ বাংলাদেশে এসে বসবাস করতে শুরু করেছিল। মুসলমান শাসনের আমলে বাংলার এই বৌদ্ধরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয় (Shri Humayun Kabir, Islam in India, Cultural Heritage of India, RKM, Vol-IV, P. 579)। সীরিয়া সহ তৎকালীন বৌদ্ধ অধ্যুসিত মধ্য এশিয়াতেও এই একই ঘটনা ঘটেছিল। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে, বৌদ্ধ ধর্মে জাতিভেদ প্রথা নেই। আধুনিক বিজ্ঞানও ঐ একই কথা বলে। শুধু ইট, শুধু বালি বা শুধু সিমেন্ট দিয়ে যেমন দীর্ঘস্থায়ী পাকা ইমারৎ গড়া যায় না; ইট, বালি, চুন, সুরকি সব কিছুরই প্রয়োজন হয় তেমনি বহু উপাদানে গঠিত সমাজ ও সংস্কৃতিই দীর্ঘস্থায়ী হয়। কোন্ প্রক্রিয়া বা মানসিকতার দ্বারা বহু জাতিতে বিভক্ত ভারতীয় সমাজ ইসলামীকরণের প্রচেষ্টাকে নিষ্ক্রিয় করেছিল?

প্রথমত ভারতের হিন্দু সমাজ বিদেশী মুসলমানদের কখনই সভ্য বলে গ্রহণ করতে পারেনি। এই কারণে তাঁরা তাদের যবন বা ম্লেচ্ছ বলে অভিহিত করতো। দ্বিতীয়ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই মূল চার বর্ণ থেকে কালক্রমে অসংখ্য জাতি এবং তার অসংখ্য শাখা প্রশাখার অভ্যুদয় হয়। তাই অতি নিম্নবর্ণ থেকে অতি উচ্চ বর্ণের এই শৃঙ্খলার মধ্যে যেখানেই যার অবস্থান হোক না কেন, তার মনে এই অহংকার ও গর্ববোধ আছে যে, তার নীচেও অনেক বর্ণের লোক আছে। কিন্তু মুসলমান হয়ে গেলে, "আমিও অনেকের থেকে উপরে", এই গর্বের অবসান হবে। কোন ডোম বা বাগদী মুসলমান হয়েছে তাই কোন ধোপা বা নাপিত মুসলমান হতে অস্বীকার করবে, কারণ মুসলমান হলে তাকে ডোম বা বাগদীর সঙ্গে এক পাতে খেতে হবে। মূলত এই কারণের ফলেই নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও মুসলমান হতে অস্বীকার

করে। এই মানসিকতার জন্যই জাতিবিভক্ত হিন্দু সমাজ ইস্‌লামীকরণের প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করতে সমর্থ হয়। অন্য অনেক কারণের মধ্যে এটাই অন্যতম প্রধান কারণ।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে সমাজভুক্ত মানুষের মধ্যেকার বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্যে যৌন সম্পর্কই প্রধান[৩৫] এবং মানুষ সমাজের ক্ষুদ্রতম একক বা পরিবার গঠন করে যৌনতা, বাসগৃহ ও পিতৃত্বের জন্য।[৩৬] উপরিউক্ত দৃষ্টিভঙ্গী পাশ্চাত্য সমাজের উপযুক্ত বটে, কিন্তু ভারতীয় সমাজের ক্ষেত্রে একেবারেই অচল। কারণ "আমাদের শুধু বাণপ্রস্থী এবং সন্ন্যাসীরাই একা, কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজে সকলেই একা।"[৩৭] পাশ্চাত্যে পরিবার বলতে ব্যক্তি বিশেষ ও তার স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা বোঝায়। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে এই পরিবারের সংজ্ঞা অনেক ব্যাপক। পাশ্চাত্যে কেউ চাকরি পেলে শুধু সেই ব্যক্তিবিশেষেরই চাকরি পাওয়া বোঝায়, কিন্তু ভারতে কেউ চাকরি পেলে পুরো পরিবারের চাকরি পাওয়া বোঝায়। পাশ্চাত্যে কোন সমর্থ ব্যক্তি তার স্ত্রী ও নাবালক পুত্র-কন্যার ভরণ-পোষণ করলেই তার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। কিন্তু কৌটিল্য বলেছেন, "যে ব্যক্তি আর্থিক দিক দিয়ে সমর্থ হওয়া সত্ত্বেও তার স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, বৃদ্ধ পিতা-মাতা, নাবালক ভাই ও অবিবাহিতা বা বিধবা বোনের ভরণ-পোষণ না করে তবে তার বারো পণ দণ্ড হবে।"[৩৮] তিনি আরও বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজেকে এবং পোষ্যদের বঞ্চিত করে নির্লজ্জভাবে টাকা সঞ্চয় করে রাজা সেই কৃপণের সমস্ত ধন বাজেয়াপ্ত করবেন।"[৩৯] তাই ভারতীয় কোন পরিবারের বড় ছেলে যখন নাবালক ভাই-বোনদের মানুষ করার জন্য উপার্জনের সমস্ত টাকা খরচ করে, কিংবা বয়ঃপ্রাপ্ত বোনের বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত নিজে অপেক্ষা করে, কিংবা টাকা-পয়সা খরচ করে বৃদ্ধ বাবা-মাকে তীর্থ ভ্রমণ করতে নিয়ে যায় তখন তার মধ্যে কি যৌন বা পিতৃত্বের স্বার্থ লুকানো থাকে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা তার খোঁজ করতে পারেন। যে সমাজে বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে বৃদ্ধ বাবা-মার সঙ্গে দেখা করার জন্য ছেলে রাহাখরচ দাবি করে সেরকম স্বার্থপর সমাজের কথা ভারতবর্ষ আজও চিন্তা করতে শেখেনি। যে সমাজে নাতি-নাতনীর হাত ধরে দাদুর রাস্তায় বেড়াতে বেরোনোটা একটা বিরল দৃশ্য সে-রকম স্বার্থপর সমাজের কথা ভারতবর্ষ আজও কল্পনা করতে শেখেনি। যে সমাজে বৃদ্ধ বাবা-মা মারা গেলে ছেলেমেয়ের অনুপস্থিতিতে আণ্ডারটেকার কোম্পানীর লোকেরা মৃতদেহ কবরস্থ করে, ভগবান রক্ষা করুন, ভারতীয় সমাজ যেন অতটা সুসভ্য কোন দিনও না হয়।

---

(৩৫) Society; MacIvar & Page, p. 7. (৩৬) ঐ, p. 18. (৩৭) প্রসঙ্গ স্বদেশী, গুরুমূর্তী, পৃ: ১৬
(৩৮) অর্থশাস্ত্র - (২/১/২৮)। (৩৯) ঐ, - (২/৯/২৩,২৪)।

পাশ্চাত্য পূর্ণাঙ্গ মানুষের বিচার করতে অক্ষম ঃ

ধনমদে মত্ত ও অহমিকায় অন্ধ আজকের পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা মনে করেন যে, একমাত্র তাদের সমাজই সুসভ্য ও সংস্কৃতিসম্পন্ন। এর আরও একটা কারণ হল, এককালে তারা গায়ের জোরে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিকে তাদের উপনিবেশে পরিণত করেছিল। এই অহমিকা নগ্নভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে যখন Bernard Shaw তাঁর The man of Destinyতে বলেন, "Every Englishman is born with certain miraculous power that makes him the master of the World,[৪০] এবং Kipling কবিতা লেখেন,

"Fair is our lot, O goodly is our heritage!
Humble ye my people, and be fearful in your mirth!
He hath made the deep as dry.
He hath smote for us a pathway to the ends of all the Earth!"[৪০]

তাই যেসব দেশ এককালে তাদের পদানত ছিল, যে সব দেশের লোকদের তারা black native বলতো, তারা কোন উচ্চতর সভ্যতার মালিক হতে পারে এটা স্বীকার করতে তাদের অহমিকায় বাঁধে। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল এই যে, কোন দেশ বিদেশী দস্যুর দ্বারা বিজিত হলেই এটা প্রমাণ হয় না যে সেই দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিম্ন স্তরের। এককালে ইয়োরোপও বর্বর জাতির পদানত হয়েছিল। মোঙ্গল দস্যুদের দ্বারা মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধ সভ্যতা বিনষ্ট হয়েছিল বলে প্রমাণ হয় না যে মোঙ্গলরা বেশি সভ্য ছিল। মুসলমান আক্রমণকারীদের দ্বারা মিশর অধিকৃত হয়েছিল বলে প্রমাণ হয় না যে মিশরীয়দের থেকে মুসলমানদের আরব্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি উন্নত ছিল।

যাই হোক, অহমিকায় আচ্ছন্ন এইসব পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা তাঁদের খণ্ডিত ও আংশিক চিন্তাভাবনাগুলোকেই জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা ভাবছেন এবং অ্যারিস্টটল, প্ল্যাটো ইত্যাদি গ্রীক পণ্ডিতদের আদি গুরু মনে করে সর্বক্ষণ নমস্কার করে চলেছেন। কিন্তু মুশকিল হল, অ্যারিস্টটলের বাণী, man is a social animalকে অনুসরণ করে তাঁরা যে পশুত্বের স্তরেই থেকে যাচ্ছেন সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করছেন না, এবং তাঁদের

---

(৪০) As quoted in "Recent Political Thought", V.D. Mahajan, p. 383.

পবিত্র গ্রন্থের বাণী "...every inclination of his heart is evil from childhood" যে প্রতিনিয়ত তাঁদের কুপ্রকৃতির দিকেই ঠেলে দিচ্ছে সেদিকে লক্ষ্য করছেন না। তাঁদের আরাধ্য ঐ সমস্ত গ্রীক পণ্ডিতরা ছিলেন গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক। কিন্তু তিলকের মতে ঋগ্বেদ রচিত হয়েছিল খ্রীস্টের জন্মের ৪৫০০ বছর আগে এবং উপনিষদ ইত্যাদি বেদান্ত সাহিত্য ও দর্শন রচিত হয়েছিল খ্রীস্টের জন্মের প্রায় ১৫০০ বছর আগে। কাজেই এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে ইয়োরোপ যখন সভ্যতার হাতেখড়ি দিচ্ছে তার অনেক আগেই ভারতীয় সভ্যতা, ভারতীয় দর্শন ও আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনা পূর্ণতায় পৌঁছেছিল। অর্থাৎ যেই সময় পাশ্চাত্য অর্ধপশু ও অর্ধমানব স্তরে ছিল, সেই সুদূর অতীতেই ভারতের ঋষিরা একটি মানুষকে পূর্ণাঙ্গ ভাবে বিচার করতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন যে, শুধু শারীরিক সুখ-ভোগের দ্বারা পশুরা সুখ পেতে পারে কিন্তু মানুষ পারে না। মানসিক শান্তি না থাকলে শারীরিক সুখ নিষ্ফল হয়ে যায়।

ভারতীয় চিন্তাধারা অনুযায়ী প্রতিটি মানুষ শরীর, মন, বুদ্ধি ও আত্মার সমষ্টি। "কিন্তু এগুলি একাত্মীভূত। আমরা কোন একটিকে পৃথক করিয়া চিন্তা করিতে পারি না। পশ্চিমে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে ইহার কারণ তাঁহারা এই সকল বিষয় পৃথক করিয়া চিন্তা করিয়াছেন"।[৪১] "আমাদের ও পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, তাহারা শরীর ও তাহার সন্তুষ্টিকেই আদর্শ জ্ঞান করে এবং আমরা শরীরকে আমাদের লক্ষ্যে পৌছিবার উপায় মনে করি। আমরা বিশ্বাস করি যে, শুধু শরীরের পরিপুষ্টি হইলেই মানুষের পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয় না। সেই সঙ্গে সঙ্গে মন, বুদ্ধি ও আত্মার পরিপুষ্টি ও পরিতৃপ্তি প্রয়োজন।"[৪২] শুধু শরীরের পরিপুষ্টি ও সন্তুষ্টি বিধান করার উদ্দেশ্য নিয়েই পশ্চিমে মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল। মার্ক্সীয় তত্ত্বে মানুষ একটি জৈবিক যন্ত্রের চেয়ে বেশি কিছু নয় এবং ভাবা হয়েছিল যে, আহার, নিদ্রা, বাসস্থান ও মৈথুনের ব্যবস্থা করতে পারলেই মানুষ সুখী হবে। তাই মন, বুদ্ধি ও আত্মার পরিপুষ্টির কথা উপেক্ষিত হল এবং এই কারণেই ১০০ বছর যেতে না যেতেই মার্ক্সবাদ পৃথিবীর মাটি থেকে চিরতরে উৎখাৎ হয়ে গেল।

---

(৪১) একাত্ম মানববাদ, পৃ: ২৯। (৪২) - ঐ - , পৃ: ৩২।

চারপুরুষার্থ ঃ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ঃ

ভারতীয় চিন্তাধারা অনুযায়ী মানুষের জীবন প্রণালী, সমাজ ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাতে শরীর, মন, বুদ্ধি ও আত্মা এই চারটির পরিপুষ্টি ঘটে, সন্তুষ্টি ঘটে এবং উন্নতি সাধিত হয়। এই কারণেই, "এই ভারতবর্ষে চারিটি কর্তব্যের আদর্শ আমাদের সামনে আছে। শরীরের প্রয়োজন, পরিপূর্ণ হৃদয়ের প্রসার, বুদ্ধির বিকাশ, ও আত্মার উন্নতি সাধন। ইহাতেই মানুষ পূর্ণরূপে বিকশিত হয়। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটি পুরুষার্থ বা মানবীয় প্রয়াস। পুরুষার্থ হল সেই প্রচেষ্টা যা মানুষের উপযুক্ত। ... এই চারিটি প্রচেষ্টাকেই আমরা অভিন্নভাবে চিন্তা করিয়াছি।"[৪৩] এই পুরুষার্থ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং কোন একটিকে পৃথক ভাবে চিন্তা করার কোন অবকাশ নেই। পৃথক ভাবে চিন্তা করলে কি রকম ভুলভ্রান্তির সৃষ্টি হয় একটা উদাহরণ দিলে তা পরিষ্কার হবে। অভিন্ন ভাবে চিন্তা করতে অভ্যস্ত নয় বলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অর্থনীতি শাস্ত্র শুধু অর্থের আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ধর্ম বা ন্যায় নীতি সেখানে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত কারণ তারা মনে করে যে ন্যায়-নীতির ব্যাপারটা অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত নয়। মানুষ কত টাকা উপায় করল এবং সেই টাকা দিয়ে কি কি জিনিস কিনল এটাই তাদের আলোচনার বিষয়। এই কারণে পাশ্চাত্য অর্থনীতি মতে মানুষ যদি চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি অসামাজিক উপায়েও টাকা রোজগার করে তবে অর্থনীতিবিদ্‌দের কাছে তা সুখের বিষয় কারণ—সেই চুরি-ডাকাতির টাকাও চাহিদার সৃষ্টি করে জাতীয় আয় বাড়ায় এবং অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে।

"প্রায়ই একটি কথা শোনা যায় যে, ভারতীয় সংস্কৃতি শুধু আত্মার মুক্তির কথাই চিন্তা করিয়াছে।"[৪৪] এ অভিযোগের সমার্থ হল এই যে, ভারতবর্ষ মুনি ঋষিদের দেশ—তাই এখানে অর্থ ও কামকে কম প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বা যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। অথবা ভারতের ঋষিরা আধ্যাত্মবাদের উপরই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং বৈষয়িক উন্নতির প্রতি তেমন নজর দেননি। অথবা ভারতীয় ঋষিরা শরীরকে অবহেলা করে আত্মার উপরই বেশি জোর দিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সব ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। শরীরকে উপেক্ষা করলে উপনিষদের ঋষি

---

(৪৩) একাত্ম মানববাদ - পৃ: ৩২।
(৪৪) ঐ পৃ: ৩১।

কখনও বলতেন না, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য।"[৪৫] বাস্তবিক পক্ষে ভারতীয় যোগশাস্ত্র মুদ্রা, প্রাণায়াম, আসন, ধৌতি ইত্যাদির মাধ্যমে সুস্থ সবল শরীর ও দীর্ঘ জীবন লাভের যে উপায় আবিষ্কার করেছে, পৃথিবীর কোন জাতি কি তার সমতুল্য শাস্ত্র উপস্থিত করতে পেরেছে?

ভারতবর্ষ অর্থপুরুষার্থকে গুরুত্ব না দিয়ে বৈষয়িক উন্নতিকে উপেক্ষা করেছে এ অভিযোগও সম্পূর্ণ ভুল। ঋগ্বেদের প্রায় এক-চতুর্থাংশ সূক্ত ইন্দ্র দেবতা এবং পঞ্চমাংশ সূক্ত অগ্নি দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত। এই সমস্ত সূক্তগুলির প্রধান বিষয়ই হল অর্থ ও সম্পদের কামনা। ইন্দ্র দেবতার কাছে ধন-সম্পদ ও সুখ প্রার্থনা করা হয়েছে এবং যারা অন্যায় ভাবে অপরের ধন আত্মসাৎ করে তাদের জন্য শাস্তি প্রার্থনা করা হয়েছে।[৪৬] অগ্নি দেবতার কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে "আমাদের সুন্দর ধন দান কর," "আমাদের নিত্যধনের পতি কর"।[৪৭] দশম মণ্ডলের ১১৭ সূক্তের ৯ম ঋকে বলা হয়েছে যে, দুই হাত এক রকম দেখতে হলেও যেমন সমান কর্মক্ষম হয় না বা দুই জমজ ভাই একরকম দেখতে হলেও যেমন সমান গুণবিশিষ্ট হয় না, সেই রকম দুই জন ব্যক্তিবিশেষের মধ্যেও অর্থের তারতম্য হয়। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে অর্থকে সকলের উপরে স্থান দিয়েছেন এবং কারণ হিসাবে বলেছেন যে, অর্থ ছাড়া ধর্ম ও কাম পুরুষার্থ চরিতার্থ করা সম্ভব হয় না।[৪৮] এই কারণে অর্থের সাহায্যে স্বচ্ছলতা অর্জন করার উদ্দেশ্যে তিনি "বার্তা" বা অর্থনীতি শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং নিরলস কর্মের অনুষ্ঠানকেই আর্থিক প্রাচুর্য লাভ করার উপায় বলে নির্দেশ করে গেছেন।[৪৯]

ভগবান মনুও ঠিক একই কথা বলে গেছেন যে, অর্থ ছাড়া ধর্ম হয় না, এবং দেবঋণ, পিতৃঋণ ও ঋষিঋণ—এই তিন ঋণের কোন ঋণই পরিশোধ করা সম্ভব হয় না।[৫০] মানুষ জন্মগ্রহণ করে জল, বাতাস, সূর্যকিরণ ইত্যাদির প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে যে ঋণ করে তাকে দেবঋণ বলে। পিতা-মাতা না থাকলে এই দেহ পাওয়াই সম্ভব হত না। এই ঋণকে পিতৃঋণ বলে। মুনি-ঋষি প্রভৃতি জ্ঞানী ব্যক্তিদের লব্ধ জ্ঞান আহরণ করেই মানুষের জ্ঞানোন্মেষ হয়। এই ঋণকে ঋষিঋণ বলে।

---

(৪৫) মুণ্ডকোপনিষদ - (৩/২/৪)। (৪৬) ঋগ্বেদ - (৪/৪২, ১০/৬৪, ১০/৮৬ ইঃ)।
(৪৭) ঋগ্বেদ - (৭/৪/৭,১০)। (৪৮) অর্থশাস্ত্র - (১/৭/৬)।
(৪৯) ঐ - (১/৭/৭, ১/১৯/৩৬)। (৫০) মনুসংহিতা - (৪/২৫৭, ৬/৩৫)।

দেবতাদের উদ্দেশে পূজা, যজ্ঞ ও দান-ধ্যান ইত্যাদির মাধ্যমে দেবঋণ শোধ হয়। পিতা-মাতার সেবা ও আপন সন্তান-সন্ততিদের সযত্নে লালন-পালনের মধ্য দিয়ে পিতৃঋণ শোধ হয়। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, সন্তান-সন্ততির উপযুক্ত ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা না করে সন্ন্যাস গ্রহণ করা কৌটিল্যের মতে দণ্ডনীয় অপরাধ।[৫১] কাজেই বর্তমান পাশ্চাত্য জগতের ঘন ঘন বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং তার ফলে সন্তান-সন্ততির চরম অবহেলা কৌটিল্যের মতে যে কতখানি দণ্ডনীয় অপরাধ তা সহজেই অনুমান করা চলে। আচার্য, গুরু ও বিদ্বান ব্যক্তিদের দানধ্যান ও সেবা করার মাধ্যমেই ঋষিঋণ শোধ হয়। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ধনহীনের পক্ষে কোন ঋণই শোধ করা সম্ভব নয়। সর্বোপরি এই তিন ঋণের মধ্য দিয়ে সমাজের প্রতি ব্যক্তিবিশেষের যে কর্তব্যের আদর্শ তুলে ধরা হয়েছে তা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অবশ্যই শিক্ষণীয়।

সাংসারিক জীবনে অর্থের গুরুত্ব বোঝাতে কবি ভর্তৃহরি তাঁর "নীতি শতকম্"-এ বলেছেন যে, সমাজের দুই ব্যক্তি জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধিবৃত্তি ইত্যাদি সব দিক দিয়ে সমান হওয়া সত্ত্বেও অর্থের তারতম্য হেতু সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির হয়। শুক্রাচার্য তাঁর "রাম চরিত" আখ্যানে বলেছেন, "রাজানং প্রথমং বিন্দেৎ ততো ভার্যাং ততো ধনম্". অর্থাৎ প্রথমে কোন রাজার আশ্রয় নিয়ে নিজেকে সুরক্ষিত করবে, এবং তারপর ঘরে ভার্যা আনবে ও ধন উপার্জনের চেষ্টা করবে। শান্তি পর্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন, "মহারাজ ঐশ্বর্যকে দোষজনক মনে করো না।" জ্ঞাতিবধের মধ্য দিয়ে রাজ্যলাভ করার ফলে শোকগ্রস্ত যুধিষ্ঠির বনবাসী হতে চাইলে অর্জুন তাঁকে বলছেন, "মহারাজ, অর্থ থেকেই ধর্ম, কাম ও স্বর্গ লাভ হয়। অর্থ ছাড়া লোকের প্রাণযাত্রাও সম্ভব হয় না।" "বস্ত্র যেমন নারীর লজ্জা আবরণ করে, ধনও সেই রকম রাজার সমস্ত দোষ আবরণ করে"।[৫২]

চার পুরুষার্থের মধ্যে একমাত্র অর্থের স্থান মানুষের শরীরের বাইরে। জগতে যা কিছু ভোগের সামগ্রী আছে সমস্তই অর্থের মধ্যে পড়ে। টাকা-পয়সা বা ধনের বিনিময়ে এই সমস্ত ভোগের সামগ্রীর উপর অধিকার অর্জন করা যায় বলে সাধারণভাবে অর্থ বলতে টাকা-পয়সা বা ধন বোঝায়। এ ছাড়া "যাহাকে রাজনীতি

---

(৫১) অর্থশাস্ত্র - (২/১/২৯ - ৩১)।

(৫২) মহাভারত, রাজশেখর বসু, পৃ: ৫৬১, ৫৫৪, ৫৮৩, ৫৬৮।

ও অর্থনীতি বলা হয় তাহাও অর্থের আওতায় আসে। প্রাচীন মত অনুযায়ী বিচার এবং শাস্তিও ইহার অন্তর্গত" ।(৫৩) উপরন্তু এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, অর্থকে প্রাধান্য না দিলে ভারতে একটা সুষ্ঠু অর্থনীতি গড়ে উঠতে পারত না এবং সম্পদ ও প্রাচুর্যে ভারত পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করতে পারত না। সর্বোপরি অর্থকে গুরুত্ব না দিলে মানব জাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন অর্থনীতির গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারত না বা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মত গ্রন্থও ভারতে রচিত হত না।

পরবর্তী পুরুষার্থ "কাম"-এর স্থান হল মানুষের মনে। কাম বলতে বোঝায় মানুষের বিভিন্ন স্বাভাবিক ইচ্ছার পরিপূর্তি। সমাধি বা নির্বাণ বা কৈবল্য অবস্থায় মানুষের মন নিরুদ্ধ বা নিষ্ক্রিয় থাকে, তাই ঐ অবস্থায় মনে কোন কাম থাকতে পারে না। কিন্তু সমাধি ভঙ্গ হলে মন যদি লোভের বশবর্তী হয় তাহলে সে লোভী, যদি ক্রোধের বশবর্তী হয় তাহলে সে ক্রোধী ইত্যাদি। ইন্দ্রিয়গণই হল কাম পুরুষার্থ চরিতার্থ করার সহায়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পায়ু, উপস্থ, হস্ত, পদ ও বাক্য এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এবং মন হল একাদশ ইন্দ্রিয় ।(৫৪) এই ইন্দ্রিয়গণ হল, "ধেনুবৎ বৎসায়,"(৫৫) অর্থাৎ গাভী যেমন তার বাছুরের দ্বারা আকৃষ্ট হয় ইন্দ্রিয়গণও সেইরকম সর্বদাই কামের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। ইন্দ্রিয়গণের দ্বারাই মানুষের মনে কামের উদয় হয় এবং ইন্দ্রিয়গণের দ্বারাই সেই কামের পরিতৃপ্তি হয়। যেমন ভাল খাবারের গন্ধ নাকে গেলে খাবার লোভ জন্মায় এবং খেলে পরে জিহ্বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেই কাম তৃপ্ত হয়। পাশ্চাত্যে ইন্দ্রিয়গণ সর্বদাই বহির্মুখী, কিন্তু হিন্দু বলে, "আমার বহির্মুখী ইন্দ্রিয়গণ আত্মাভিমুখী হউক এবং বহির্বিষয় প্রকাশ না করিয়া ব্রহ্মকে প্রকাশ করিবার জন্য একাগ্র হউক" ।(৫৬)

আধ্যাত্মিক উন্নতির স্বার্থে হিন্দুশাস্ত্রে সর্বত্রই কামত্যাগের কথা বলা হয়েছে। কারণ, 'ইন্দ্রিয়গণের বিষয়াসক্তি হইতেই মনুষ্য দূষিত হইয়া থাকে'(৫৭) এবং "অর্থ-কামে আসক্তিশূন্য ব্যক্তিবর্গেরই ধর্মজ্ঞান হয়"(৫৮)। "কামাত্মা হওয়া যদিও উচিত নয়

(৫৩) একাত্ম মানববাদ, পৃ: ৩২, ৩৩। (৫৪) মনু - ২/৯০, ৯১; সাংখ্য - ২/১৭, এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে দার্শনিক Locke ও মনকে ইন্দ্রিয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মনকে তিনি internal sense বলেছেন। (H. W. P., 589)। (৫৫) সাংখ্য দর্শন - (২/৩৭)।
(৫৬) শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ - (২/১, ২/৩)। (৫৭) মনুসংহিতা - (২/৯৩)। (৫৮) ঐ - (২/১২)।

তবু কামনার অতীত হওয়াও অসম্ভব''[৫৯], উপরন্তু ''লোকে যা কিছু কর্ম করে তা সবই কামনা-প্রসূত, কারণ নিস্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করা সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নয় এবং এই কারণে অকামী লোকের মধ্যে কোন কর্মোদ্যমই লক্ষ্য করা যায় না''[৬০]। কাজেই সকলেই যদি কাম ত্যাগ করে তবে সংসারে কোন কর্মোদ্যমই থাকবে না। অতএব জিতেন্দ্রিয় সাধক পুরুষদের বাদ দিলে মধ্যপন্থা অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত বা ধর্মাশ্রিত কামই সাধারণের পথ। সাধারণ মানুষ 'ইন্দ্রিয়সমূহকে আয়ত্তাধীন রেখে, মনকে সংযত করে, উপায়বলে দেহকে পীড়া না দিয়ে সমুদায় পুরুষার্থই সাধন করবে''[৬১]। এইভাবে সে ''আলব্ধং চৈব লিপ্সেৎ'' অর্থাৎ যা এখনও তার অধিকার আসেনি (বিশেষ অর্থে ধন) তাও লাভ করার জন্য যত্ন করবে[৬২]।

এখানেই তৃতীয় পুরুষার্থ ''ধর্ম''-এর আবির্ভাব, যার স্থান হল মানুষের বুদ্ধিতে। এই বুদ্ধি চালাকি নয়, পরের অনিষ্ট চিন্তা করার জন্য নয়[৬৩] বা পরের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে চালনা করার জন্যও নয়[৬৪]। একে বলা হয় নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। যে বুদ্ধি ধর্ম-অধর্ম, ন্যায়-অন্যায় ও সৎ-অসতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে কর্তব্য-অকর্তব্য স্থির করতে সাহায্য করে তাই হল নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। সাঙ্খ্য দর্শনে এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকেই মহত্তত্ত্ব বলা হয়েছে। কামের প্রতি উদ্ভ্রান্তের মত ধাবিত হওয়া থেকে বুদ্ধি বা ধর্ম মানুষকে রক্ষা করে।''রশ্মি (বলগার দড়ি) যেমন অশ্বকে, অঙ্কুশ যেমন হস্তিকে, সেইরূপ ধর্ম মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করে''[৬৫]। সারথি যেমন অশ্বগণকে সংযত রাখে, বিদ্বান ব্যক্তিরাও সেইরূপ আকর্ষণশীল বিষয়সমূহের প্রতি স্বতই ধাবমান ইন্দ্রিয়গণকে ধর্মের দ্বারা সুসংযত করিতে চেষ্টা করিবেন''[৬৬]। কাজেই ধর্মহীন মানুষ বল্গাহীন রথের মতই উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হয়ে, কামের প্রতি উদ্দাম গতিতে ছুটে শেষ পর্যন্ত কোন খানা-ডোবায় হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য। পক্ষান্তরে ধর্মাশ্রয়ী ব্যক্তির পক্ষেই কামনাকে নিয়ন্ত্রিত করে কল্যাণকর দিকে চালিত হয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব।

হিন্দুশাস্ত্রে ধর্মের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক এবং তা মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়া বা গীর্জায় গিয়ে উপাসনা করার মত বাহ্যিক ক্রিয়া সম্পাদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

---

(৫৯) মনুসংহিতা - (২/২)।(৬০) ঐ - (২/৪)।
(৬১) ঐ (২/১০০)।(৬২) ঐ - (৭/৯৯)।(৬৩) মনুসংহিতা - (২/১৬১)।(৬৪) ঐ - (৪/১৭৭)।
(৬৫) মহাভারত, রাজশেখর বসু, পৃ: ৫৬০।(৬৬) মনুসংহিতা - (২/৮৮)।

'ইংরাজীতে বহু ভ্রান্ত অনুবাদের মত ধর্মকে "রিলিজিয়ন" বলিয়া বর্ণনা করার ফলে অত্যন্ত অহিতকর বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। ... ফলে পাশ্চাত্যের সংকীর্ণ রিলিজিয়নের আদর্শকেই ধর্ম নামে অভিহিত করা হইল। যেহেতু পাশ্চাত্য দেশগুলিতে এই তথাকথিত রিলিজিয়নের নাম অন্যকে পীড়ন, সংঘর্ষ ও সংগ্রাম হইয়াছে, সুতরাং অনেকেই এইগুলিকে ধর্মের দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে"[৬৭]। ভগবান মনু বলেছেন,

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্।।"

অর্থাৎ ধৃতি (সন্তোষ), ক্ষমা, দম (বিষয় সংসর্গেও মনের অবিকার), অস্তেয় (চুরি না করা), শৌচ (দেহশুদ্ধি), ইন্দ্রিয় সংযম, ধী (সংশয় বিলোপকারী সম্যক বুদ্ধি), বিদ্যা (আকিঞ্চন), সত্য ও অক্রোধ—এই দশটি ধর্মের লক্ষণ"[৬৮]। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য নয়টি ধর্মলক্ষণের কথা বলেছেন এবং উপরিউক্ত দশটি লক্ষণ থেকে শৌচকে বাদ দিয়েছেন[৬৯]।

সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, ধর্মের উপরিউক্ত ব্যাখ্যার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র নাই। এখানে কোথাও বলা হয়নি যে, যে যীশুর শরণাপন্ন না হবে তার পরিত্রাণ নেই[৭০], বা যারা যীশুকে বিশ্বাস না করে তারা ঈশ্বরের সান্নিধ্য পাবার যোগ্য নয় এবং তাদের প্রতি ঈশ্বরের ক্রোধ বর্ষিত হবে[৭১], বা তারা অনন্ত নরকের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে[৭২]। অথবা এমন কথা বলা হয়নি যে, যারা কোরান ও মহম্মদের নবীত্বে বিশ্বাস না করে তারা কাফের এবং পশুর সমান[৭৩]। এরা সবাই নরকে যাবে[৭৪] এবং এদের সাথে বন্ধুত্ব করাও উচিত নয়[৭৫]। আল্লা এদের জন্য নিদারুণ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন[৭৬] এবং এরা নিষ্ঠুর ভাবে বধযোগ্য[৭৭]। এদের জন্য ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকবে এবং যেখানে পাবে বন্দী করবে ও হত্যা করবে[৭৮]। এদের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ কর, গর্দানে আঘাত কর[৭৯], শূলবিদ্ধ কর অথবা বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কেটে দাও[৮০]।

---

(৬৭) একাত্মমানববাদ, পৃ: ৫০।(৬৮) মনুসংহিতা - (৬/৯২)।(৬৯) যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা - (১/১২২)।
(৭০) Ii Timothy - 3. (৭১) John - (14.6; 3.36). (৭২) III Thessalonians - (1.8).
(৭৩) কোরান - (৭/১৭৯)। (৭৪) ঐ - (৩/৮৫)। (৭৫) কোরান - ৫/৫৭)।(৭৬) -ঐ- (৪/১৪৭), (৪/১৪৮), (৮/১০-১৪)। (৭৭) -ঐ- (৩৯/৩০-৩২)। (৭৮) -ঐ- (২/১৯১), (৯/৫), (৪/৮৯), (৪/৯১)। (৭৯) কোরান - (৮/৩৯), (৪৭/৪)।(৮০) -ঐ- (৫/৩৩)।

পক্ষান্তরে উপরিউক্ত শ্লোকে ভগবান মনু সনাতন ধর্মের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে মানবিকতার চূড়ান্ত উৎকর্ষের কথাই বলা হয়েছে। এ ধর্ম সমগ্র মানব জাতির জন্য, বিশেষ কোন মানবগোষ্ঠীর জন্য নয়। "যাহাই মানুষকে উন্নত করে তাহার নাম ধর্ম। পশুত্বকে দূর করিতে হইবে, মানবত্বকে দেবত্বে লইয়া যাইতে হইবে। ... এইভাবে উচ্চতর ক্রমবিকাশ লাভ করিয়া অবশেষে সে পূর্ণতার পরাকাষ্ঠা অমৃতত্ব লাভ করিবে"।(৮১) "ধর্ম হচ্ছে মানুষের ভিতরে যে ব্রহ্মত্ব প্রথম থেকেই বর্তমান তারই প্রকাশ"(৮২)। অনুকূল ঠাকুর খুব অল্প কথায় ধর্ম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, "অপরকে রাখে ও নিজে থাকে, জেনে রাখিস ধর্ম বলে তাকে"(৮৩)। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে শুধু সনাতন হিন্দু ধর্মেই অপরকে রাখার কথা আছে। পক্ষান্তরে খ্রীস্টান ও ইসলামের মূল লক্ষ্যই হল অপরের বিনাশ। কিন্তু হিন্দুধর্মে "অন্যান্য জাতির সর্বস্ব লুণ্ঠন ও সর্বনাশ করিবার জন্য পদভরে ভূকম্পকারী সৈন্য প্রেরণের ব্যবস্থা নাই"(৮৪)। হিন্দু বলে, "...বিদ্যা ও ধর্মের পায়ের তলায় তরোয়াল রইল। তার (তরোয়ালের) একমাত্র কাজ ধর্ম রক্ষা করা, মানুষ ও গবাদি পশুর পরিত্রাণ করা। বীরের নাম আপৎ ত্রাতা ক্ষত্রিয়"(৮৫)।

"খ্রীস্টধর্ম চিরকালই তরবারির জোরে প্রচারিত হয়েছে। কি আশ্চর্য, খ্রীস্টের মত নিরীহ মহাপুরুষের শিষ্যরা এত নরহত্যা করেছে"(৮৬)। "... তলোয়ার ছাড়া খ্রীস্টধর্ম কোথায় সফল হয়েছে? ... আমি জানি, তোমাদের পূর্বপুরুষেরা কি করে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। তাদের সম্মুখে দুটি বিকল্প ছিল, হয় ধর্মান্তর গ্রহণ, নয় মৃত্যু—এই তো"(৮৭)। "এখানে লক্ষণীয় যে, মুসলমানরা এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অপরিণত ও সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন। তাহাদের মূলমন্ত্র, আল্লা এক এবং মহম্মদই একমাত্র পয়গম্বর। যাহা কিছু ইহার বহির্ভূত সে সমস্ত কেবল খারাপই নহে, উপরন্তু সে সমস্তই তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করিতে হইবে; যে কোন পুরুষ বা নারী এই মতে সামান্য অবিশ্বাসী তাহাকেই নিমেষে হত্যা করিতে হইবে; যাহা কিছু এই উপাসনা পদ্ধতির বহির্ভূত তাহাকেই অবিলম্বে ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে; যে কোন গ্রন্থে অন্যরূপ মত প্রচার

(৮১) বিবেকানন্দ রচনাবলী - (১০/২০)।
(৮২) - ঐ- (৬/৪০০)। (৮৩) সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ভাষণ।
(৮৪) বিবেকানন্দ রচনাবলী - (৫/৬৮)। (৮৫) -ঐ- (৬/২০৯)।
(৮৬) -ঐ- (৪/২৫০)। (৮৭) -ঐ- (৫/৪১৭)।

করা হইয়াছে সেগুলিকে দগ্ধ করিতে হইবে। প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত ব্যাপক এলাকায় দীর্ঘ পাঁচশত বৎসর ধরিয়া রক্তের বন্যা বহিয়া গিয়াছে। ইহাই মুসলমান ধর্ম"[(৮৮)]।

পক্ষান্তরে সংস্কৃত "ধর্মের নিকটতম পরিভাষা হইতে পারে 'Innate Law', যদিও ইহাতে ধর্মের পরিপূর্ণ অর্থ পরিস্ফুট হয় না।"[(৮৯)] কোন কোন ভারতীয় লেখক ধর্মের ইংরাজী প্রতিশব্দ করেছেন "moral values"[(৯০)]। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান সত্য বা virtueকে ধর্মের প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করেছেন[(৯১)]। যাই হোক, মূলত "ধর্ম এদেশে নিয়ম বা নীতি হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।"[(৯২)] অবশ্য ধর্ম বলতে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ, যাগযজ্ঞ বা আজকের পূজা-অর্চনাকেও বোঝায়। কিন্তু ব্যপক অর্থে "... ধর্ম কতগুলি নীতি ও নিয়মের সমষ্টি, যাহা সমাজিক আচরণ, অর্থ ও কামকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া অভিন্ন ও সুশৃঙ্খল জীবন বিকাশের সহায়তা করে"[(৯৩)]। সংস্কৃত ধর্ম শব্দ "ধৃ" ধাতু থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ ধারণ করা। কাজেই ধর্ম শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল, "যাহা ধারণ করে"। যে সমস্ত নিয়ম-নীতি সমাজকে ধারণ করে বা যে সমস্ত স্বাভাবিক নিয়ম-নীতির উপর ভিত্তি করে এই সমাজ টিকে আছে বা যে সমস্ত নিয়ম-নীতি ব্যতীত সভ্য সমাজ টিকে থাকতে পারে না, বিনষ্ট হয়ে যায় তাই ধর্ম। "আমরা ধর্মে বিশ্বাস করি এ জন্য যে, ইহা সভ্য জীবন যাপনের মূল নীতি। ... উচ্ছৃঙ্খলতা ধর্মনাশের কারণ হয়। বিশৃঙ্খলা অরণ্যের নীতি আনয়ন করে—যেখানে সবল দুর্বলকে পীড়ন ও শোষণ করে"[(৯৪)]। কাজেই সনাতন হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী পরপীড়ন অধর্ম। সেই হেতু ভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রতি পীড়ন ও অত্যাচারের নীতি থাকায় খ্রীস্টধর্ম, ইসলাম ইত্যাদি সেমিটিক ধর্মমতগুলি অধার্মিক।

ধর্মই যে সমাজকে ধারণ করে তা পরিষ্কার হয় যখন শান্তিপর্বে ভীষ্ম বলেন, "পুরাকালে (বা সত্যযুগে) রাজা ছিল না, রাজ্য বা দণ্ড ছিল না, দণ্ডার্হ লোকও ছিল না। প্রজারা ধর্মানুসারে পরস্পরকে রক্ষা করত"[(৯৫)]। এই প্রসঙ্গে দার্শনিক Locke-এর কিছু চিন্তা-ভাবনার কথা আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক হবে। তিনি বলেছেন

---

(৮৮) বিবেকানন্দ রচনাবলী - (৪/১২৫)। (৮৯) একাত্ম মানববাদ - পৃ: ৫৫।
(৯০) M. Hiriana, Cultural Haritage of India - (III/647).
(৯১) Hindu View of Life - p. 56. (৯২) একাত্মমানববাদ - পৃ: ২৮।
(৯৩) -ঐ- পৃ: ৩৩। (৯৪) -ঐ- পৃ: ৩৪। (৯৫) মহাভারত, বসু, পৃ: ৫৬২।

সব মানুষ ততটা দূরদর্শী বা prudent হয়ে ওঠেনি বলেই তারা ব্যক্তিগত সুখ ও স্বার্থের পিছনে ধাবিত হচ্ছে, সমষ্টিগত স্বার্থের প্রতি কোন নজর দিচ্ছে না। কিন্তু সে যেদিন যথেষ্ট দূরদর্শী হবে তখন বুঝতে পারবে যে সমষ্টির ক্ষতি করে ব্যক্তির লাভ করতে গেলে দূর ভবিষ্যতে তা ব্যক্তিরই ক্ষতি করে। এই ভাবে সব মানুষ যখন যথেষ্ট দূরদর্শী হবে তখন সেই সমাজে কোন পুলিশ বা আইন-আদালতের প্রয়োজন হবে না। সব মানুষই ন্যায় আচরণ করবে এবং এই ন্যায়-অন্যায় নির্ধারিত হবে কিছু স্বাভাবিক আইন-কানুন বা natural law-এর ভিত্তিতে।[৮৬] কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে Locke যাকে natural law বলেছেন, আমাদের ঋষিরা তাকেই ধর্ম বলে গেছেন এবং Locke যাকে ন্যায় আচরণ বলেছেন আমাদের ঋষিরা তাকেই ধর্মাশ্রিত আচরণ বলেছেন। তবে বর্তমান সমাজের শান্তি-রক্ষার জন্য Locke তাঁর সমাজকে ধর্মাশ্রয়ী হতে না বলে পুলিশ বাহিনীর হাতেই সে দায়িত্ব অর্পণ করার পরামর্শ দিয়েছেন[৮৭]। কারণ যে সমাজে পারিবারিক শান্তিরক্ষার জন্যও পুলিশ থাকতে হয় সেই সমাজের জনতার হাতে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব তুলে দেবার চিন্তা বাতুলতা মাত্র। অথচ ভারতীয় সমাজ হাজার হাজার বছর ধরে ধর্মের আদর্শ ও শিক্ষায় শিক্ষিত হবার দরুন অত্যন্ত অল্প সংখ্যক পুলিশ বাহিনী দিয়েও ভারতে শান্তি রক্ষা করা সম্ভব। ভারতের এমন অনেক প্রত্যন্ত গ্রাম আছে যেখানকার মানুষ জীবনে কোনদিনও পুলিশ দেখেনি।

ভগবান মনু বলেছেন, "ধর্মকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না"(৮/১৫)। "সমাজের পক্ষে শুভ ও মঙ্গলজনক বলে যে সমস্ত নিয়মনীতি ধর্মের স্বীকৃতি লাভ করেছে তার স্থান সকলের উপরে, রাজা, এমন কি ঈশ্বরও ধর্মের অধীন"[৮৮]। এ ব্যাপারে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে পবিত্র ধর্মগ্রন্থে গড আদমকে সৃষ্টি করে তাকে এই পৃথিবীর উপর একচ্ছত্র ভোগ ও শাসন করার স্বৈরাচারী ক্ষমতা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠাচ্ছেন এবং বলেছেন, "... increase in number; fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and birds in the air and over every living creature that moves on the ground."[৮৯]। এই

(৮৬) Hist. Westn. Phil. - p. 602.

(৮৭) Hist. Westn. Phil. - p. 593.

(৮৮) একাত্ম মানববাদ, পৃ: ৩৪, ৫৫, ৫৬।

(৮৯) Genesis - (1/28).

শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ইয়োরোপের রাজারা নিজেদেরকে গডের প্রতিভূ ও একচ্ছত্র অধিপতি বলে মনে করতেন। এই সমস্ত ধ্যান-ধারণা ঐসব রাজাদের কতখানি স্বৈরাচারী করে তুলেছিল তা রাজা চতুর্দশ লুই-এর একটা উক্তির মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি বলেছেন, "I am the state. What I desire is decree."(১০০) অর্থাৎ আমিই রাষ্ট্র। আমি যা ইচ্ছা করি সেটাই আইন। পক্ষান্তরে ভারতের রাজা ধর্মের অধীন এবং প্রজাপীড়ন নয় প্রজাপালনই তার ধর্ম। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন, "যার রাজ্যে প্রজাগণ পিতার গৃহে পুত্রের ন্যায় নির্ভয়ে বিচরণ করে সেই রাজাই শ্রেষ্ঠ। গর্ভিণী যেমন নিজের প্রিয় বিষয় ত্যাগ করে গর্ভেরই হিতসাধন করে, রাজাও সেইরূপ নিজের হিত চিন্তা না করে প্রজারই হিতসাধন করবেন"।(১০১) রাজা যদি স্বৈরাচারী হন এবং প্রজাপালনরূপ স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হন তবে সেই রাজা ধ্বংসপ্রাপ্ত হন(১০২)। পুরাকালে নহুষ, বেন, সুদাস, সুমুখ ইত্যাদি রাজারা ধর্মভ্রষ্ট হবার দরুন বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে ধর্মাশ্রয়ী রাজার খ্যাতি অমরত্ব লাভ করে। ধর্মপরায়ণ রাজা পৃথুর নাম থেকেই এই মেদিনীর নাম "পৃথিবী" হয়েছিল। তিনি প্রজারঞ্জন করতেন বলে "রাজা" এবং ব্রাহ্মণগণকে ক্ষত (বা ক্ষতি) থেকে ত্রাণ করতেন বলে "ক্ষত্রিয়" উপাধি পেয়েছিলেন।

যেহেতু ধর্ম, অর্থ ও কাম একাত্মীভূত তাই ধর্মকে অর্থ ও কাম থেকে পৃথক ভাবে চিন্তা করার কোন কারণ নেই। অর্থ যেমন ধর্মলাভের সহায়ক, তেমনি ধর্মও অর্থলাভের সহায়ক"(১০৩)। তথাকথিত সমাজবাদীরা দিনরাত জোর গলায় চিৎকার করে বলছে যে, ধর্ম মানুষের রুটি-রুজির ব্যবস্থা করতে পারে না। এ ব্যাপারে স্বামীজি বলেছেন, "ধর্ম কি সত্যিই মানুষের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করিতে পারে? অবশ্যই পারে, ধর্ম সর্বদাই তাহা করে এবং তদপেক্ষা অনেক বেশি কিছু করে; ইহা মানুষকে অনন্ত মহাজীবন আনিয়া দেয়, ইহা মানুষকে মানুষ করিয়াছে এবং পশুমানবকে দেবত্বে উন্নীত করিয়াছে। ... মানবসমাজ হইতে ধর্মকে বাদ দিন, কি পড়িয়া থাকিবে? বর্বরে পরিপূর্ণ একটি অরণ্যানী ব্যতীত আর কিছুই থাকে না।"(১০৪) "গত দুইশত বৎসর যাবৎ কতকগুলি অজ্ঞ অথচ পণ্ডিতমন্য ব্যক্তির নিকট হইতে ভারতীয়

---

(১০০) আধু: ইয়ো: ইতিহাস, (রায়), পৃ: ৪৭।
(১০১) মহাভারত, বসু, পৃ: ৫৬১। (১০২) অর্থশাস্ত্র - (১/৬/৪)।
(১০৩) একাত্ম মানববাদ - পৃ: ৩৩। (১০৪) বিবেকানন্দ রচনাবলী - (৩/২৪৭)।

ধর্মের বিরুদ্ধে একমাত্র অভিযোগ শোনা যাইতেছে যে, ধর্ম দ্বারা সাংসারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লাভের সুবিধা হয় না, "কাঞ্চন" লাভ হয় না, উহা সমগ্র জাতিকে দস্যুতে পরিণত করে না, বলবানকে গরীবের ঘাড়ে পড়িয়া তাহার রক্ত পান করিতে সাহায্য করে না! সত্যই ধর্ম এরূপ করে না"(১০৫)। ভারতীয় ধর্ম বলে, "মানুষ সহ যে কোন প্রাণীপীড়ন অধর্ম"(১০৬)। "পরের অনিষ্ট চিন্তা অধর্ম"(১০৭)। শঠতা ও প্রবঞ্চনাহীন বৃত্তি গ্রহণ করাই ধর্ম"(১০৮), "শুধু প্রাণরক্ষার জন্য ধন উপার্জন করাই ধর্ম, বেশি ধনের চেষ্টা করা অধর্ম"(১০৯)। ধর্মই মানুষকে পশু থেকে পৃথক করেছে। তাই ধর্মহীন সমাজ পশুর সমাজ, অরাজক মাৎস্যন্যায়ের সমাজ।(১১০)

সবথেকে বড় কথা হল, দস্যুতা না করে, শুধু ধর্মের পথে ভারত এককালে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী, ঐশ্বর্যশালী দেশে পরিণত হয়েছিল এবং বিভিন্ন বর্বর বিদেশী শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তাদের অধার্মিক নীতির প্রভাবে ধর্মচ্যুত হবার ফলেই তার আজকের অধঃপতন। কাজেই আজ যদি ভারত নিজের ধর্ম ত্যাগ করে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করতে যায় তবে কি তার উন্নতি হবে? কখনই না, বরং তার অধঃপতন আরও ত্বরান্বিত হবে। "তোমরা যদি ধর্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্য জাতির জড়বাদ-সর্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিন পুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে। ধর্ম ছাড়িয়া দিলে হিন্দুর জাতীয় মেরুদণ্ডই ভাঙিয়া যাইবে।...ফল দাঁড়াইবে সম্পূর্ণ ধ্বংস।"(১১১) "এই ধর্মপথের অনুসরণ করাই ভারতের জীবন, ভারতের উন্নতি ও ভারতের কল্যাণের একমাত্র উপায়।"(১১২)

---

(১০৫) বিবেকানন্দ রচনাবলী, (৫/৬৮)। (১০৬) মনুসংহিতা - (৪/৬৮)।
(১০৭) -ঐ-, (২/১৬১)। (১০৮) -ঐ-, (৪/১১)। (১০৯) মনুসংহিতা - (৪/৩, ৪/১২)।
(১১০) অর্থশাস্ত্র (১/৪/১৩)। (১১১) বিবেকানন্দ রচনাবলী (৫/৪৬)। (১১২) -ঐ-, (৫/৬৭)।

পাশ্চাত্য ও ভারতীয় বিশ্বকল্পনা ঃ

প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিগত জীবন, সমাজ জীবন ইত্যাদি ব্যাপারে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পূর্বোক্ত পার্থক্যগুলি পাশ্চাত্য ও ভারতীয় বিশ্বকল্পনা ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। খ্রীস্টধর্ম, ইসলাম ইত্যাদি সেমিটিক ধর্মমত অনুযায়ী এই বিশ্ব সসীম ও একটি যন্ত্র বিশেষ। এই যান্ত্রিক বিশ্বের চালক আল্লা বা গড এই বিশ্বের বাইরে স্বর্গ নামক স্থানে বসবাস করেন। এ ব্যাপারে জার্মান দার্শনিক লিবনিৎস্ বলছেন যে, এই বিশ্ব যে চলছে তার একটা কারণ আছে, যে কারণ নির্ভরশীল নয় এবং বিশ্বের অন্তর্গত সমস্ত কারণ সেই পরম কারণের উপর নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে সেই পরম কারণ যদি বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত হত তবে তা নির্ভরশীল হয়ে পড়ত। কাজেই বিশ্বের চরম নিয়ন্ত্রক কারণের অবস্থান অবশ্যই বিশ্বের বাইরে। তিনি আরও বলেছেন যে এই চরম নিয়ন্ত্রক কারণ একমাত্র শাশ্বত সত্যের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এই পাশ্চাত্য সত্য কি হতে পারে? লিবনিৎসের মতে সেই শাশ্বত সত্য হল গডের মনের ইচ্ছা।(১১৩) এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে সেমিটিক ধর্মমত অনুযায়ী আল্লা বা গডের মনের ইচ্ছাই চূড়ান্ত কারণ এবং তিনি যা ইচ্ছা করেন নিমেষে তা করে ফেলতে পারেন। Let there be light বলে তিনি আলো সৃষ্টি করেন, শূন্য থেকে বস্তু সৃষ্টি করেন। যাই হোক লিবনিৎসের এই চূড়ান্ত কারণই অ্যারিস্টটলের "Unmoved mover" বা "uncaused cause", এই ব্যাপারে হেগেল যে যুক্তি দেখিয়েছেন সেটাও একটু বলে রাখা ভাল। তিনি বলেছেন ঈশ্বর বা গড বলতে আমরা যা বুঝি, তার একটা বিশেষ গুণ হল সময়ের সঙ্গে তার কোন পরিবর্তন নেই। যেহেতু বিশ্বের অন্তর্গত সমস্ত কিছুই সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনশীল সেই কারণে গড বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন না।

এই গড বা আল্লা জৈবিক দেহধারী, প্রাকৃতিক গুণসম্পন্ন, মানবাকৃতি, সদা ক্রোধে রক্তচক্ষু একজন পুরুষ মানুষ। তিনি অদৃশ্য (invisible) কিন্তু নিরাকার নন। ইসলামের মতে আল্লার উচ্চতা ষাট হাত। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে গড জৈবিক দেহধারী বলেই হেগেলের যুক্তি অনুযায়ী তাঁকে বিশ্বের বাইরে স্থানান্তরিত করা জরুরী হয়ে পড়ে। এই বিশ্বপরিকল্পনার একটা মস্ত ত্রুটি হল এই যে তা বর্তমান

---

(১১৩) Hist. West. Phil. pp. 568, 569.

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এককালে বিশ্ব খুবই ছোট ছিল। খ্রীস্টীয় মতে চন্দ্রমণ্ডল ও তার উপর সূর্যমণ্ডলই বিশ্বের সীমানা। প্রাচীন গ্রীক মতও তাই। ইসলামের মত আরও বিচিত্র এবং তাদের ধারণা অনুযায়ী আকাশ হল একটা কঠিন ছাদ যা আল্লা কোন স্তম্ভ ছাড়াই পৃথিবীর উপর স্থাপন করে রেখেছেন এবং আকাশের গায়ে নক্ষত্ররা হল স্বর্গবাসীদের হাতে ধরে থাকে ফানুষের আলো। কাজেই তখন বিশ্ব ছোট থাকায় স্বর্গ ও সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গবাসী ঈশ্বরও বিশ্ব তথা মনুষ্যজাতির নিকটবর্তী ছিলেন। এত নিকটবর্তী ছিলেন যে ৬২২ খ্রীস্টাব্দে নবী মহম্মদের পক্ষে পার্থিব তিন কি চার ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সজ্ঞানে, জাগ্রত অবস্থায় সমস্ত স্বর্গ ভ্রমণ বা "মেরাজ" করে পৃথিবীতে ফিরে আসা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে বিশ্বের বিস্তৃতি যত বাড়ছে, স্বর্গ ও স্বর্গবাসী আল্লা বা গড পৃথিবী থেকে ততই দূরে সরে যাচ্ছেন। আজ যদি জ্যোতির্বিদ্‌রা এক লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে কোন নক্ষত্র বা নীহারিকা আবিষ্কার করেন তবে ঈশ্বরও ততখানি দূরে সরে যেতে বাধ্য। কাজেই কোনদিন যদি এটা প্রমাণ হয় যে বিশ্ব অসীম তাহলে স্বর্গ ও স্বর্গবাসী ঈশ্বরের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হবার উপক্রম হবে। এই কারণে ফরাসী দার্শনিক ডেকার্তে তাঁর "Le Monde" নামক গ্রন্থে "বিশ্ব অসীম" একথা ঘোষণা করলেন বটে তবে চার্চের রোষানলে পড়ার ভয়ে সে গ্রন্থ প্রকাশ করতে সাহস করলেন না। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর বন্ধুদের দ্বারা ঐ গ্রন্থের কিছু খণ্ডিত অংশই শুধু প্রকাশিত হয়[১১৪]।

উপরিউক্ত ধর্মমতগুলিতে গড বা আল্লার ক্রোধ একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এবং বিধর্মী ও পাপীদের প্রতি ক্রোধপরবশ হয়ে তিনি তাদের অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেন। তিনি সর্বশক্তিমান হয়েও শয়তানের ভয়ে সর্বদাই ভীত। অন্যদিকে মানুষ মূলত পাপী ও শয়তানের দ্বারা পরিচালিত। এই প্রসঙ্গে খ্রীস্টধর্মের আদিম পাপের ধারণা স্মরণ করা যেতে পারে। কাজেই মানুষ কখনই আল্লা বা গডের সমকক্ষ হতে পারে না। একটা ভেড়া পবিত্র হতে পারে কিন্তু একটা মানুষ পবিত্র হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, একজন উচ্ছৃঙ্খল, পাপাসক্ত ও অসভ্য পশুভাবাপন্ন ব্যক্তিকে দেখলেই এ ধারণা জন্মানো স্বাভাবিক যে সে শয়তানের দ্বারা পরিচালিত এবং এইরকম একজন পুত্রকে শাসন করার জন্য স্বাভাবিক ভাবেই একজন ক্রোধী পিতার

(১১৪) Hist. West. Phil. p. 543.

প্রয়োজন হয়ে পড়ে। উপরিউক্ত মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় যখন H.G. Wells ইসলাম ও খ্রীস্টধর্মের আদি পয়গম্বর আব্রাহাম (বা ইব্রাহিম)-কে "সেমিটিক যাযাবর ও বর্বর পশুপালক" বলেন এবং ডেভিড, সলোমন (কোরানের দাউদ, সুলেমান) ইত্যাদির রাজত্বকালকে "বর্বর শাসকদের দ্বারা বর্বর লোকদের শাসনের গল্প" বলে মন্তব্য করেন।[১১৫] কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে, বর্বর সেমিটিক পশুপালকদের দ্বারা উদ্ভূত এই সমস্ত অযৌক্তিক তত্ত্ব পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষিত সমাজও নির্বিবাদে গ্রহণ ও মান্য করে চলেছে। এই প্রসঙ্গে ভগবান মনুর একটি উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলছেন, "যে সকল শাস্ত্র বেদমূলক নহে, বরং পুরুষ-কল্পিত, তাহারা উৎপন্ন হইতেছে ও বিনষ্ট হইতেছে। আধুনিকতা হেতু তাহাদিগকে নিস্ফল ও মিথ্যা বলিয়া জানিবে" (মনুসংহিতা-১২/৯৬)।

সনাতন হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গী উপরিউক্ত সেমিটিক দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণ বিপরীত। হিন্দুধর্ম ও দর্শনমতে এই বিশ্বের নিয়ন্তা কখনও প্রাকৃতিক গুণসম্পন্ন হতে পারেন না। সেহেতু বস্তু ব্যতীত গুণের অস্তিত্ব অসম্ভব। তাই তিনি গুণসম্পন্ন হলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়বস্তু সমন্বয়ে গঠিত হবেন বা বাস্তব দেহধারী হবেন। কিন্তু বাস্তব দেহধারী হলে সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনশীল হবেন, শাশ্বত হতে পারবেন না। এই কারণে হিন্দুর ঈশ্বর—পরমাত্মা, ব্রহ্ম বা পুরুষ দেহধারী নন এবং তিনি নির্গুণ[১১৬]। তিনি সত্ত্ব, রজঃ, তম এই তিন গুণের অতীত বা ত্রিগুণাতীত[১১৭], তিনি পুরুষও নন, নারীও নন[১১৮]। "হিন্দু বলেন, আত্মা নির্বিশেষে, সর্বব্যাপী ও অনন্ত"[১১৯]। কাজেই এই দিক থেকে বিচার করলেও উপরিউক্ত সিদ্ধান্তে থাকতে হয় যে সর্বব্যাপী ব্রহ্ম কখনও দেহধারী বা সাকার হতে পারেন না।[১২০] "স যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাস্ত উদকমেবানুমিলীয়তে ন হাস্যোদ্‌গ্রহণায়েব স্যাৎ" অর্থাৎ জলে লবণ ফেললে তা যেমন জলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে যায়, তাকে আর আলাদা করে তোলা যায় না, এই দৃশ্যমান অসীম ব্রহ্মাণ্ডেও সেই রকম সর্বব্যাপী ব্রহ্মে লীন হয়ে

(১১৫) A Short Hist. Of the World, pp. 84, 87.
(১১৬) সাংখ্য: - (১/৫৪, ১/১৩৯)।
(১১৭) সাংখ্য: - (১/১৪১, ১৪৬)। (১১৮) শ্বেতা: - (৫/১০)।
(১১৯) বি. রচনাবলী - (৩/৩২০)।
(১২০) কঠ: (২/২/২, ২/১/১০), মুণ্ডক (২/২/৭, (২/২/১১) শ্বেতা: (৩/৯, ৩/১১) ইত্যাদি।

আছে[১২১]। তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন এবং তিনি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর ও স্থূল থেকে স্থূলতর [১২২]। বিশ্বের সমস্ত অণুপরমাণুর মধ্যেই তিনি "চিৎ" বা চৈতন্যরূপে বিরাজ করছেন[১২৩]। মানুষ সহ দৃশ্য অদৃশ্য সকল বস্তু ব্রহ্ম থেকেই উৎপত্তি লাভ করে আবার ব্রহ্মেই লীন হয় [১২৪]। এই বিশ্বে একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য, শাশ্বত ও সত্য[১২৫] এবং তিনিই আমাদের সামনে বহুরূপে প্রতিভাত হচ্ছেন[১২৬]। কাজেই ভারতীয় মতে এই বিশ্বের নিয়ন্তা ব্রহ্ম বিশ্বের বাইরে অবস্থান করেন না, এই বিশ্বের মধ্যেই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছেন।

জড়বাদী চার্বাক দর্শন যেমন মনে করে যে এই জৈবিক দেহই আত্মা, ঠিক সেই রকম জড়বাদী পাশ্চাত্য সমাজের মতেও দেহটাই মানুষের আসল পরিচয়, দেহটাই আমি। কিন্তু হিন্দু ঋষি প্রশ্ন তুলেছেন যে, যদি দেহটাই আমি হই তাহলে দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকেই আমার আমার বলি কেন? তাহলে দেহের কোন্ অঙ্গটা আমি? শুধু বস্তুগত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই নয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি অবস্তুগত গুণাবলীকেও আমার আমার বলি। তাহলে আমি কে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই হিন্দু ঋষি আধ্যাত্মিক জগতের চরম সত্য আবিষ্কার করেছেন। "আমার দেহ, আমার মন, আমার বুদ্ধি, এই রূপ সম্বন্ধি সম্বন্ধের উল্লেখ দ্বারাই দেহ ও আত্মার বিভিন্নতা নিশ্চিত হইয়া থাকে।"(ষষ্ঠী ব্যপদেশাদপি। ন শিলাপুত্রবৎ ধর্মিগ্রাহকমানবাধাৎ।)[১২৭] কাজেই হিন্দু মতে শরীরটা আমি নই। পক্ষান্তরে সর্বব্যাপী যে পরমাত্মা আমার শরীরে চৈতন্য রূপে রয়েছেন তিনিই আমি। শরীরটা নয় অন্তরস্থিত আত্মাই আমি। সেই আত্মাই মানুষের আসল পরিচয়। পরমাত্মা যদি অগ্নি হন তবে জীবাত্মা তার স্ফুলিঙ্গ[১২৮]। জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক ও অভিন্ন—যেমন

(১২১) বৃহদারণ্যক: (২/৪/১২)।

(১২২) মুণ্ডক - (৩/১/৮), শ্বেতা: - (১/১৭, ৪/২০), মুণ্ডক (২/২/২)।

(১২৩) শ্বেতা: - (৫/৯, ৬/১১)।

(১২৪) তৈত্তিরীয়: (২/৬, ৭; ৩/৬)। মুণ্ডক: (১/১/৮,৭)। ঐতরেয়: (২)। শ্বেতা: (৪/১, ৪/৪, ৬/৬।

(১২৫) শ্বেতা: (১/৯, ৪/১, ৪/১০, ৬/১৫, ৬/১৭)।

(১২৬) কঠ: (২/২/৯, ২/১/১০)। শ্বেতা: (৬/১২)। (১২৭) সাঙ্খ্য (৬/৩, ৪)।

(১২৮) যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা - (৩/৬৩), মুণ্ডক (২/১/১)। আত্মাই মানুষের প্রধান পরিচয়, তাই কেউ মারা গেলে একজন ভারতীয় বলে যে, সে দেহত্যাগ করেছে—অর্থাৎ আত্মা দেহকে ত্যাগ করেছে। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য বলে যে, দেহ আত্মাকে ত্যাগ করেছে।

আকাশ এক হলেও ঘটাকাশ, পটাকাশ ইত্যাদি পৃথক মনে হয়; যেমন সূর্য এক হলেও বহু জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত হতে দেখলে পৃথক পৃথক প্রতীয়মান হয়, সেইরকম পরমাত্মা এক হলেও জীবাত্মা বহু বলে মনে হয়।[১২৯] কুম্ভকার যেমন একই মাটি দিয়ে বিভিন্ন আকারের বস্তু তৈরি করে কিন্তু মূল উৎপাদন একই থাকে সেই রকম এক পরমাত্মা জীবাত্মার মধ্যে বহুরূপে প্রতীয়মান হন[১৩০]। "ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং"—জীবাত্মাও পূর্ণ, পরমাত্মাও পূর্ণ। তেলের দ্বারা যেমন দ্বীপ প্রজ্বলিত থাকে তেমনি পরমাত্মার দ্বারাই সমস্ত জীব চৈতন্যময় হয়ে আছে[১৩১]।

এই প্রসঙ্গে বলা চলে যে পাশ্চাত্যের দার্শনিকদের মধ্যেও আত্মার ধারণা ছিল এবং তাঁদের অনেকেই আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। যেমন প্ল্যাটো মনে করতেন যে, দেহ দৃশ্য তাই নশ্বর এবং আত্মা অদৃশ্য তাই শাশ্বত। মানুষের সুখ-দুঃখ আত্মাকে শরীরের সঙ্গে আটকে রাখে। মৃত্যুর পর পুণ্যাত্মারা স্বর্গে ও পাপীরা নরকে যায়। কিন্তু তাদের ঈশ্বর জৈবিক দেহধারী হওয়ার দরুন মানবাত্মার সঙ্গে সেই ঈশ্বরের কি সম্পর্ক এ ব্যাপারে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছানো তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তাই Cebes মনে করতেন যে মৃত্যুর পর আত্মার বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। Plato মনে করতেন যতক্ষণ আত্মা মানুষের শরীরের মধ্যে থাকে ততক্ষণ তা অশুদ্ধ থাকে। মৃত্যুর পর আত্মা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং তখনই তা শুদ্ধ হয়। তাই জীবিত অবস্থায় আত্মা সম্বন্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয় এবং মৃত্যুর পরই তা সম্ভব।[১৩২] ঠিক একই কারণে কোরান বলছে যে, আত্মা সম্পর্কে মানুষকে খুবই অল্প জ্ঞান দেওয়া হয়েছে (১৭/৮৫)।

উপরিউক্ত বিভিন্ন আলোচনা থেকে মানুষ সম্পর্কে হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গী ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গীর মূল প্রভেদটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্য মতে আদিম পাপ থেকে মানুষের উৎপত্তি তাই মূলত সে পাপী। পক্ষান্তরে হিন্দু মতানুযায়ী মানুষ মূলত পবিত্র ও সর্ব গুণান্বিত কারণ জীবাত্মা ও পরমাত্মা বা ব্রহ্ম এক এবং অভিন্ন। তাই একমাত্র হিন্দু ঋষিই সমগ্র মানব জাতিকে "অমৃতের পুত্র" বলে সম্বোধন করতে পেরেছেন (শ্বেঃ২/৫), বলতে পেরেছেন, "স য এষোণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"—সেই সূক্ষ্ম, যাহার দ্বারা এই সমস্ত

---

(১২৯) যাজ্ঞ: (৩/১৪৪)। (১৩০) -ঐ- (৩/১৪৬)। (১৩১) -ঐ- (৩/১৬৫)।
(১৩২) Hist. of West. Phil. pp.-102,155.

জগৎ আত্মবান; তিনিই পরমার্থ সত্য, তিনিই আত্মা; হে শ্বেতকেতু তুমিই সেই আত্মা[১৩৩]। "যখনই "তত্ত্বমসি" আবিষ্কৃত হইল তখনই আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পূর্ণ হইল ... "[১৩৪]। কাজেই ভারতীয় ঋষি মানুষকে পাপী বলেননি, বরং তার মধ্যে দেবত্বকে আবিষ্কার করে কেমন করে সে সেই দেবত্বে উপনীত হতে পারে সেই পথেরই সন্ধান করেছেন। তাকে সামাজিক পশু, অর্থনৈতিক পশু বা যৌন কামনাতুর পশু আখ্যা দিয়ে পশুত্বের স্তরে চিরকালের মত আবদ্ধ করে রাখার ব্যবস্থা করে যাননি। "পৃথিবীর অন্যত্র যখন মানুষ গুহাবাসী হইয়া কাঁচা মাংস ভক্ষণ করিত তখনই ব্রহ্মাবর্তের ঋষিগণ, সাধনার দ্বারা জীবদেহধারী মানবকে পশুত্ব হইতে দেবত্বে উন্নীত করা যাইতে পারে এই সত্য ঘোষিত করেন। অদ্যাবধি অন্য কোন ধর্ম ইহার কল্পনামাত্র করিতে পারে নাই"[১৩৫]। কাজেই ভারতীয় ধর্ম হল মানুষকে সেই দেবত্বে উন্নীত করার উপায় এবং এই উদ্দেশ্যে "...ঋষিগণ বিভিন্ন স্তরের বহুমুখী সাধনার প্রবর্তন করিয়াছেন, যাহা অবলম্বন করিয়া যে কোন মানুষ ধীরে ধীরে নিজেই ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারেন"[১৩৫]। এক জন্মে এই লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নাও হতে পারে এবং যতদিন সেই দেবত্ব প্রকাশিত না হয় ততদিন সে বার বার জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীতে ফিরে আসে এবং অন্তর্নিহিত দেবত্ব উপলব্ধি হলে, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান হলে তার মোক্ষলাভ হয়, পুনর্জন্ম চক্র থেকে রেহাই পায় কারণ আত্মজ্ঞানই মুক্তি[১৩৬]। কাজেই সনাতন হিন্দু ধর্ম মতে ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান লাভ করে মোক্ষ লাভ করাই মানুষ্য জন্মের চরম লক্ষ্য—স্বর্গে গিয়ে স্বর্গীয় সুরায় নেশা করে স্বর্গীয় রমণীদের সঙ্গে কামনা চরিতার্থ করা নয়।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে গ্রীক দার্শনিক প্ল্যাটো সম্ভবত পুনর্জন্মে বিশ্বাসী ছিলেন। কারণ তিনি বলছেন যে, যেহেতু জীবন ও মৃত্যু দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে, এবং যেহেতু জীবনের পর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, সেই হেতু মৃত্যুর পর জীবনও অবশ্যম্ভাবী। আর এক জায়গায় তিনি বলেছেন যে, মৃত্যুর পর পুণ্যাত্মারা স্বর্গে যায় কিন্তু পাপীরা পশু হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে। তিনি যখন বলেন যে, জন্মের আগেও আত্মা ছিল এবং পূর্বেকার অস্তিত্ব থেকে আত্মা বর্তমান

---

(১৩৩) ছান্দোগ্যোপনিষদ্ - (৬/৮/৭)। (১৩৪) বিবেকানন্দ রচনাবলী - (৫/১৪১)।
(১৩৫) হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব, শ্রীদুর্গাদাস বসু সরস্বতী, পৃ: ২৬৩।
(১৩৬) কঠঃ (২/৩/৮); শ্বেতাঃ (১/৭; ৪/১৬; ৬/১৯, ২০), মুণ্ডক (২/২/৮; ২/২/৫) যাজ্ঞ: (৩/১৬০); মনু (১২/৮৫)।

চৈতন্য আনয়ন করে, তখন মনে হয় তিনি, শুধু পুনর্জন্মই নয়, আত্মার অবিনশ্বরতার মত কোন ধারণাও মনে পোষণ করতেন[১৩৭]।

কখন মানুষ আত্মজ্ঞানের মাধ্যমে মোক্ষলাভ করে? "ব্রহ্মৈবসন্ ব্রহ্মাপ্যেতি,"- মানুষ যখন সাধনার দ্বারা ব্রহ্মের মতই নির্মল, শুদ্ধ ও অপবিত্র হন, ব্রহ্মের মতই ত্রিগুণাতীত হয়ে জাগতিক সুখ-দুঃখের অতীত হন, তখনই তাঁর কামনাশূন্য নির্মল হৃদয়ে আত্মা উদ্ভাসিত হন (কঠঃ ২/৩/৯,১৪)। তখন তাঁর আর কোন জ্ঞাতব্য থাকে না (শ্বেতাঃ ১/১২) এবং কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নির মত সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন করেন (শ্বেতাঃ ১/১৩)। তখন তাঁর "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই উপলব্ধি হয় (ছাঃ ৩/১৪/১)। নদী সাগরে গিয়ে যেমন সাগরের সাথে একাকার হয়ে মিশে যায় (মুণ্ডক-৩/২/৮) ব্রহ্মজ্ঞানীও সেইরকম ব্রহ্মে লীন হয়ে যান।

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্বিজানিতাত্মা ভবতি গৌতম।। (কঠঃ ২/১/১৫)

"হে গৌতম, নির্মল জলে নির্মল জল প্রক্ষিপ্ত হলে তা যেমন এক রসত্ব প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মজ্ঞানীও সেইরূপ ব্রহ্মের সাথে একাত্ম হন।"

স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ
ব্রহ্মৈবো ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি।

সেই ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই হইয়া থাকেন এবং তাঁর কুলেও সেই অব্রহ্মবিদ্ হন না।"

তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং
গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি।। (মুণ্ডকঃ ৩/২/৯)

"তিনি শোক সন্তাপ অতিক্রম করেন, ধর্মকর্ম অতিক্রম করেন এবং হৃদয়স্থ অবিদ্যা গ্রন্থিসমূহ হইতে মুক্ত হইয়া অমরত্ব লাভ করেন।"

অহিংসয়েন্দ্রিয়াসঙ্গৈর্বৈদিকৈশ্চৈব কর্মভিঃ।
তপসশ্চরণৈশ্চোগ্রৈঃ সাধয়ন্তীহ তৎপাদম্।।

অর্থাৎ অহিংসা, ইন্দ্রিয়গণের বিষয়াশক্তি পারিহার, বৈদিক কর্ম ও উগ্র তপশ্চারণ দ্বারা সেই ব্রহ্মপদ লাভ করা যায় (মনুঃ ৬/৭৫)। ভগবান মনু বলেছেন,

(১৩৭) Hist. West. Phil, pp. 151, 152, 153.

''গৃহস্থ যখন দেখবেন যে তার গাত্রচর্ম লোল হয়েছে, কেশ পক্ব হয়েছে এবং পুত্রেরও পুত্র জন্মেছে, তখন তিনি অরণ্যের আশ্রয় গ্রহণ করে মোক্ষ লাভের জন্য যত্নবান হবেন (৬/২)। এবং

অস্থিস্থূনং স্নায়ুযুতং মাংসাশোনিতলেপনম্
চর্মাবনদ্ধং দুর্গন্ধিপূর্ণং মূত্রপুরীষয়ো।।
জরাশোকসমাবিষ্টং রোগায়তনমাতুরম্।
রজস্বলমনিত্যঞ্চ ভূতাবাসমিমং ত্যজেৎ।। (৬/৭৬,৭৭)

অর্থাৎ অস্থিরূপ স্থম্ভে বিবৃত, স্নায়ুরূপ রজ্জুদ্বারা বদ্ধ, রক্তমাংস দ্বারা প্রলিপ্ত, চর্মদ্বারা আচ্ছাদিত, মুত্র ও বিষ্ঠাদ্বারা পূর্ণ, দুর্গন্ধময়, জরা থেকে আক্রান্ত, নানা প্রকার ব্যাধির মন্দির, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, প্রায়ই রজোগুণযুক্ত, অনিত্য ও পঞ্চভূতের আবাসস্বরূপ, এইরূপ জানিয়া এই দেহের মায়া ত্যাগ করিবেন। যাতে আবার এই দেহরূপ করাগারে প্রবেশ করিতে না হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিবেন। তিনি বৃক্ষমুলে বসতি করিবেন (৬/২৬), শুধু প্রাণ ধারণের জন্য দিনে একবার মাত্র অষ্টগ্রাস ভোজন করিবেন (৬/২৮), অথবা মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া শুধু ফলমূল আহার করিয়া দিন যাপন করিবেন (৬/২৫)। সর্ববিষয়ে নিস্পৃহভাবে, মোক্ষার্মী হইয়া একাকী এই সংসারে বিচরণ করিবেন (৬/৪৯)। নির্জন স্থানে বসবাস করিতে করিতে ক্রমে ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিবেন (৬/৫৯), উত্তম ও অধম সকল ব্যক্তির মধ্যেই ব্রহ্মের অবস্থান আছে এইরূপ চিন্তা করিবেন (৬/৬৫)। দিনে ও রাত্রে খুব সাবধানে পা ফেলিবেন যাহাতে ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গের প্রাণ নাশ না হয় (৬/৬৮)। এই ভাবে তিনি ক্রমে ক্রমে সমস্ত আসক্তি, মানাপমান, শীতোষ্ণ, সুখ-দুঃখাদি হইতে মুক্ত হইয়া নিয়ত ব্রহ্মে অবস্থান করেন এবং সমুদায় কর্মফলকে অতিক্রম করিয়া, সন্ন্যাসবলে বিগতপাপ হইয়া মুক্তিলাভ করেন (৬/৮১,৯৬)।

ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল উপরিউক্ত ধর্ম ও মোক্ষের সমকক্ষ উচ্চ আদর্শ আর কোন ধর্ম বা দর্শন মানুষের সামনে উপস্থিত করতে পেরেছে বলে বর্তমান লেখকের জানা নেই। তবে পাশ্চাত্যের কোন শাস্ত্র যে পারেনি এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। ''জীবদেহধারী মানুষকে সাধনার দ্বারা ব্রহ্মত্ব সম্পাদনের সংকল্প লইয়া বিশ্ব সভ্যতার স্বল্পালোকিত ঊষায় প্রাচ্য ভূখণ্ডে হিন্দু ঋষিগণ যে ধর্ম প্রবর্তন করিয়া সমগ্র বিশ্বকে উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন ... (তাহার) কল্পনামাত্রও অন্য কোন ধর্ম

অদ্যাবধি করিতে পারে নাই"[১৩৮]...। দেহসর্বস্ব ভোগবাদী পাশ্চাত্য সমাজ চালিত হয় শুধু অর্থ ও কামের দ্বারা। তাই ধর্ম বলতে কি বোঝায় তাই তারা জানে না, মোক্ষ তো অনেক দূরের কথা। হিংসা ও স্বার্থপরতা ছাড়া যে সমাজের কোন তত্ত্ব নেই, সেই সমাজের পক্ষে ধর্ম ও মোক্ষের তাৎপর্য অনুধাবন করা সত্যই অসম্ভব ব্যাপার। যে সমাজে প্রাকৃত সুখই চরম লক্ষ্য তাদের কাছে ত্যাগের মাহাত্ম্য প্রচার করতে যাওয়া বাহুল্য মাত্র। পাশ্চাত্য বলছে, "Pleasure is good, pain is bad; only pleasure is disired and pleasure is desirable", ভারতের ঋষি বলেন, "প্রাকৃত সুখ সুখ নয়, এই সুখ ক্ষণস্থায়ী। কারণ যাহার উৎপত্তি আছে তাহারই বিনাশ আছে" এবং সুখের বিনাশেই দুঃখের উৎপত্তি। যম যখন নচিকেতাকে বললেন, "পৃথিবীতে যাহা যাহা কাম্য ও দুর্লভ, তৎসমস্ত কাম্য বস্তুই যথেচ্ছ প্রার্থনা কর"(কঠঃ ১/১/২৫), তখন নচিকেতা বললেন, "শ্বোভাবা মর্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ সর্বেন্দ্রিয়ানাং জরয়ন্তি তেজ!" "হে যমরাজ, আপনার বর্ণিত ভোগ্যবস্তুসমূহ কল্য পর্যন্ত থাকিবে কিনা তাহা অনিশ্চিত;" "অপি সর্বং জিবিত সম্পমেব তবৈব বাহাস্তবে নৃত্যগীতে।।" (কঠঃ ১/১/২৬)—"অধিকন্তু সকলেরই জীবন স্বল্প। অতএব রথাদি, (সুন্দরী রমণী ও তাহাদের) নৃত্যগীত আপনারই থাকুক।" ভারতবর্ষ এই নচিকেতাকেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছে। "ভূমৈব সুখম; নাল্পে সুখমস্তি"। ক্ষণিকের সুখ নয়—অখণ্ড ধারাবাহিক নিত্যসুখ সাক্ষাৎকার করিতে হইবে। ভোগের দ্বারা সে সুখের সম্ভাবনা নেই, তাই ত্যাগ, বৈরাগ্য ও সাধনার দ্বারা প্রাকৃত সুখ-দুঃখকে অতিক্রম করে সেই নিত্যসুখের, অপ্রাকৃত সুখের সন্ধান করতে হবে— "আনন্দং ব্রাহ্মণো রূপং তচ্চ মোক্ষে প্রতিষ্ঠিতং" সেই আনন্দকে আস্বাদন করতে হবে। আত্মার স্বরূপে অবস্থিতি করে মুক্তি পেতে হবে।

পাশ্চাত্যের "survival of the fittest" এবং হিন্দুর "তত্ত্বমসি" যেন দুই মেরুর দুই তত্ত্ব—এক তত্ত্ব পরপীড়নে উৎসাহ যোগাচ্ছে এবং অপর তত্ত্ব বলছে, "জীবাত্মা সেই অনন্ত ও সর্বব্যাপী পরমাত্মার অংশ বিশেষ, অতএব প্রতিবেশীকে আঘাত করিলে প্রকৃতপক্ষে নিজেকেই আঘাত করা হইবে।"[১৩৯] এই শিক্ষায় শিক্ষিত বলেই একজন অক্ষরজ্ঞানহীন হিন্দুও বলতে পারে যে, মানুষ তো বটেই, এমন কি

(১৩৮) হিন্দু ধর্মের সারতত্ত্ব, শ্রীদুর্গাদাস বসু, পৃঃ - ২৬৩।
(১৩৯) বিবেকানন্দ রচনাবলী - (৩/৩২০)

ইতর প্রাণী বা গাছপালাকেও কষ্ট দিতে নেই। কারণ সবার ভিতরেই ভগবান আছেন, সবাই কৃষ্ণের জীব। এই কারণে হিন্দুর সাধনমার্গের প্রথম শর্তই হল অহিংসা। এই কারণেই হিন্দু শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব ইত্যাদি নানা দলে উপদলে বিভক্ত হয়েও নিজেদের মধ্যে হানাহানি মারামারি করে না, কারণ সে জানে যে, বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনা করার মধ্য দিয়ে একই ব্রহ্মের উপাসনা করা হচ্ছে। "একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি" (ঋক্ ১/১৬৪/৪৬)। হে অর্জুন, যাহারা শ্রদ্ধা সহকারে অন্য দেবতার আরাধনা করে, তাহারাও না জানিয়া আমাকেই ভজনা করে (গীতাঃ ৯/২৩)। "যে ভক্ত অচলা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যে দেবতার পূজা করে, প্রকৃতপক্ষে সে সকল দেবতা আমিই (গীতাঃ ৭/২২)"। কাজেই হিন্দুর বহু দেবদেবীর উপাসনা, যার জন্য পাশ্চাত্য হিন্দুকে polytheist বলতে দ্বিধা করে না, নিতান্তই বাহ্যিক। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি হিন্দুই চূড়ান্তভাবে একেশ্বরবাদী। এব্যাপারে পাশ্চাত্যের অজ্ঞতাও ভগবান নিজেই ব্যাখ্যা করে গেছেন—কিন্তু "যোগমায়ায় সমাচ্ছন্ন আমি সকলের কাছে প্রকাশিত হই না, তাই মূঢ়গণ অব্যয়স্বরূপ আমাকে বোঝে না (গীঃ ৭/২৫)। তাই পাশ্চাত্য দেশে আল্লা, গড ও জিহোবার উপাষকদের মধ্যে হানাহানি মারামারি লেগেই আছে। ইসলামের আগে আরবে অনেক রকম দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল এবং তাদের উপাসকদের মধ্যে রক্তারক্তি, মারামারি একটা নিত্যকার ব্যাপার ছিল। আজও আয়ারল্যাণ্ডের রোমান ক্যাথলিক ও ইংল্যাণ্ডের প্রেটেস্ট্যাণ্টদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বিদ্যমান এবং লেবানন, রোমানিয়া ও মধ্য এশিয়ার খ্রীস্টান, মুসলমান ও ইহুদীদের মধ্যে রক্তগঙ্গা বয়ে যাচ্ছে।

যীশুর সঙ্গে জগৎ পিতা গডের কি সম্পর্ক এ নিয়ে খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে খ্রীস্টানদের মধ্যে ঘোরতর মতভেদ উপস্থিত হয়। সাধু পল (St. Paul) মনে করতেন যে মিশরের দেবতা ওসিরিস (Osiris) যীশুরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, কারণ সেই সময় এরকম জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল যে ওসিরিস্ আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবেন এবং মানবজাতিকে অমরত্বের রাস্তা দেখাবেন। অনেকে মনে করতো যে, যীশুও পবিত্র দেবতা, তবে জগৎপিতার সমকক্ষ নন্, কিছুটা নিকৃষ্ট। সাবেলিয়ানরা মনে করতো যে, যীশু জগৎপিতা গডেরই কিছুটা অংশ এবং তিনি একাধারে যীশু ও জগৎপিতা। ট্রিনিটারিয়ানরা মনে করতো গড একাধারে তিন—একাধারে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। এই নিয়ে খ্রীস্টানদের মধ্যে প্রবল বাক্-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয় এবং প্রথমে তর্ক-বিতর্ক ও শেষে যুদ্ধ ও রক্তারক্তির পর তরবারির জোরে ট্রিনিটারিয়ানদের

মতই প্রতিষ্ঠিত হয়[১৪০]। কিন্তু যীশুকে জগৎপিতার পুত্র বলায় মুসলমানদের মধ্যে ঘোর আপত্তি দেখা দেয় কারণ কোরানে আল্লা বলেছেন যে তাঁর কোন স্ত্রী নেই (৬/১০১)। তাই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, স্ত্রী না থাকাতে আল্লা গমনই বা করবেন কিসে আর পুত্রই বা উৎপাদন করবেন কেমন করে। তাই আল্লার কোন পুত্র থাকতে পারে না[১৪১]। আল্লা মা মেরীতে গমন করে পুত্র উৎপাদন করেছিলেন, এ যুক্তিও আল্লার পক্ষে সম্মানজনক হতে পারে না[১৪২]। এই কারণে মুসলমানদের দৃষ্টিতে খ্রীস্টানরা ঘৃণিত কাফের এবং বধযোগ্য।

খ্রীস্টানরা বলে যে, যীশু পবিত্র কারণ আদিম পাপ থেকে তাঁর জন্ম হয়নি। কিন্তু ইহুদীদের এতে ভীষণ আপত্তি। তাদের ধারণা যীশু মা মেরীর অবৈধ সন্তানের বেশী কিছু নয়। খ্রীস্টান ও ইহুদীদের মধ্যে বিবাদের এই কারণ। অথচ এই তিনটি ধর্মমত একই সেমিটিক গল্পগাথা থেকে উৎপন্ন। জগৎপিতা ঈশ্বর (গড, আল্লা এবং জিহোবা)-এর আকৃতি-প্রকৃতি, তাঁর জগৎ সৃষ্টি এবং আদিম মানব-মানবী আদম ও ঈভের মাধ্যমে বর্তমান মানব জাতির উৎপত্তির তত্ত্ব তিন ধর্মেই এক। উপরন্তু আদম থেকে শুরু করে আব্রাহাম (ইব্রাহিম), মোজেস (মুসা), সলোমন (সুলেমান), ডেভিড (দাউদ) ইত্যাদি পুরাণো ধর্মগুরুদের তিন ধর্মের লোকই মান্য করে।

"Evrey human being is a living temple of God", বা "প্রত্যেক মানুষই ঈশ্বরের জীবন্ত মন্দির", খ্রীস্টধর্মের এ বাণীকে কেন্দ্র করে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অস্ফালনের শেষ নেই। তাদের মতে এই বাণী বিশ্বমানবতা বা বিশ্বভ্রাতৃত্বের পরাকাষ্ঠা এবং সমগ্র মানবজাতির উপর এর প্রভাব অপরিসীম। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষ ও ধর্মসমন্বয়কারী পণ্ডিতরাও হা হা করে চেঁচিয়ে ওঠেন, বলেন, "এই তো, খ্রীস্টধর্মের মধ্যেও অদ্বৈতবাদের কথা রয়েছে"। তাই এই মহান বাণী সম্পর্কে দু একটি কথা বলা প্রয়োজন। প্রথমত এখানে প্রত্যেক মানুষ বলতে কোন্ মানুষদের কথা বলা হয়েছে? অবশ্যই খ্রীস্টধর্মাবলম্বী মানুষদের কথাই বলা হয়েছে। যে সব বিধর্মী heathenদের প্রতি গডের ঘৃণার শেষ নেই,

---

(১৪০) Short Hist. of the World, p. 159.

(১৪১) কোরান - (২/১১৬, ৪/১/৭১, ১০/৬৮, ১৭/১১১, ২৩/৯১।

(১৪২) কাবার পথে, আব্দুল আজিজ আসআমন, ২য় খণ্ড, পৃঃ - ১৯০।

যাদের বাগে পেলে গড ছেড়ে কথা বলবেন না এবং যাদের জন্য গড অনন্ত নরকের ব্যবস্থা করে রেখেছেন, সেই heathenরাই আবার গডের মন্দির হবে তা অসম্ভব। কোরানে গরীবদের জাকাত (ভিক্ষা) দিতে বললে তা যেমন শুধু গরীব মুসলমান বোঝায় এও ঠিক তাই। এই বাণী সমগ্র মানবজাতির জন্য হলে ইহুদীদের গ্যাস চেম্বারে ঢোকানোর আগে হিটলারকে দ্বিতীয়বার চিন্তা করতে হত এবং বিভিন্ন দেশের দুর্বল জাতির লোকেদের কচুকাটা করার সময় সুসভ্য ইয়োরোপীয় খৃস্টানদের হাত কেঁপে উঠত। এ প্রসঙ্গে এটাও অনুমান করা চলে যে, পাশ্চাত্যের কোন পণ্ডিত গীতা বা উপনিষদের শ্লোকের মত একটা শ্লোকও যদি রচনা করত তবে তারা কত আস্ফালনই না করতো।

দ্বিতীয়ত এখানে living temple of God বলা হয়েছে, temple of living God বলা হয়নি। অর্থাৎ মানুষ ঈশ্বরের জীবন্ত মন্দির কিন্তু জীবন্ত ঈশ্বরের মন্দির নয়। কাজেই মানুষ ঈশ্বরের জীবন্ত মন্দির হতে পারে কিন্তু সে মন্দির খালিই পড়ে আছে। ঈশ্বর সে মন্দিরে নেই। এটা তাদের তত্ত্বের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ, কারণ জৈবিক দেহধারী স্বর্গস্থ পিতার পক্ষে একই সঙ্গে সকল মানুষের হৃদয়ে থাকা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে গডের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে তাঁর অস্তিত্বই লোপ পাবে।

পাশ্চাত্যের সেমেটিক ধর্মমতগুলোকে খুব সহজেই বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে তুলনা করা চলে। আজকের রাজনৈতিক দলগুলির উদ্দেশ্য যেমন সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করা, এই ধর্মমতগুলির উদ্দেশ্যও তাই। যেমন করে হোক, অন্য ধর্মাবলম্বী লোকদের ধর্মান্তরিত করে সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। নির্লজ্জ পাইয়ে দেবার রাজনীতি। ইহ জন্মে অর্থ, সুযোগ-সুবিধা ও পরজন্মে অক্ষয় স্বর্গসুখের লোভ দেখিয়ে সদস্যসংখ্যা বাড়ানো এবং এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে শারীরিক পীড়ন। একজন বিশ্ববিখ্যাত খ্রীস্টান মহিলা সমাজ সেবার আড়ালে পাইয়ে দেবার নীতি অবলম্বন করে কত শত গরীব হিন্দুকে যে ধর্মান্তরিত করেছেন আমরা তার কোন খবর রাখি না। পক্ষান্তরে সেই মহিলার মহত্ত্ব কীর্তন করতে করতে চোখের জল ফেলি। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলার আছে, তা হল খ্রীস্টান পাদ্রীদের ঔদ্ধত্য। এই দেশের ধর্ম ও গ্রন্থের মাহাত্ম্য অনুধাবন করা যাদের সাধ্যের অতীত সেই সমস্ত অর্বাচীনরা বাইবেলের মত একখানা বর্ণপরিচয় গ্রন্থ বগলে করে এদেশের মানুষকে ধর্মশিক্ষা দিতে আসে। এ ব্যাপারে একটা বিখ্যাত

উক্তি স্মরণ না করে পারা যায় না, তা হল—"দেবদূতেরা যেখানে ভয় পায়, মূর্খরা সেখানে অগ্রসর হয়"।

"তত্ত্বমসি" ভারতীয় ধর্ম ও জীবন দর্শনের মূল ভিত্তি হবার ফলে এই দেশে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, পরমত সহিষ্ণুতার ও মুক্ত চিন্তার যে মহান আদর্শ স্থাপিত হয়েছে তা জগতে বিরল। একদিকে নানা ভাষা নানা মতের দেশ হয়েও "একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি"-এর আদর্শ সমগ্র জাতিকে এক নিগূঢ় ঐক্য বন্ধনে বেঁধে রেখেছে(১৪৩)। অপরদিকে বিনা বাধায় শতফুল বিকশিত হয়েছে। এখানে কেউ কোনদিন বলেনি, "নাযারেথের যীশুর মধ্যে সত্যের প্রকাশ হইয়াছিল; আমাদের সকলকেই উহা মানিয়া লইতে হইবে,"(১৪৪) কোন প্রশ্ন করা চলবে না। এখানে কেউ কোনদিন বলেনি যে, এই হল স্বয়ং আল্লার বাণী, একে মেনে নিতে হবে, অন্যথায় গলা কাটা যাবে; অথবা এই হল সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব, একে মেনে নিতে হবে, তা না হলে তোমার বেঁচে থাকার অধিকার নেই। পক্ষান্তরে ভারতের ঋষিরা বলতেন যে, যতক্ষণ না তোমার মন তৃপ্ত হয়, অবিদ্যা দূর হয়, বিবেক জাগ্রত হয়, ততক্ষণ প্রশ্ন কর। এখানে নচিকেতা যমকে প্রশ্ন করে, মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করে, গৌতম জৈবলিককে প্রশ্ন করে, ভৃগু পিতা বরুণকে প্রশ্ন করে। এদেশে আরুণির কাছে সাতবার প্রশ্ন করে শ্বেতকেতুর বিবেক জাগ্রত হয়। প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দিয়েই ভারতবর্ষ সত্যে পৌঁছুতে চেয়েছে এবং পেরেছে। এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে প্রশ্নকর্তা প্রশংসিত, বধযোগ্য নয়। এদেশে চিন্তা জগতের দাসত্ব স্বীকৃত হয়নি বলেই শত মত, শত পথ, শত শত চিন্তাভাবনার দ্বারা জ্ঞানের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়েছে। এক মতাবলম্বীদের দ্বারা অন্য মতাবলম্বীর পুঁথিপত্র দগ্ধ করার মত ঘৃণিত কাজের কথা এদেশের মানুষ কোনদিন চিন্তাও করতে পারেনি।

যে ভারতবর্ষ বেদকে অভ্রান্ত ও অপৌরুষেয় বলে সকলের উপরে স্থান দিয়েছে, সেই ভারতবর্ষেই বেদবিরোধী বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদ শুধু বিনা বাধায় প্রচারিত হয়েছে তাই নয়, গৌতম বুদ্ধ বিষ্ণুর অবতার বলে মান্যতা লাভ করেছেন।

---

(১৪৩) এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক Vincent Smith লিখছেন, "India beyond all doubt possesses a deep underlying fundamental unity, far more profound than that produced either by geographial isolation or by political superiority.' (as quoted in Hindu View of life", p. 13).

(১৪৪) বিবেকানন্দ রচনাবলী-

আজও দশাবতার বন্দনার মধ্যে "কেশাধৃত বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে" গীত হয়ে আসছে। উদার ও মুক্ত চিন্তার দেশ বলেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণকারী[১৪৫] হয়েও কপিল মহর্ষি বলে পূজিত হয়ে আসছেন। শুধু তাই নয়, স্বয়ং ভগবান ঘোষণা করতে দ্বিধা করছেন না, "সিদ্ধপুরুষদের মধ্যে আমিই কপিল মুনি" (গীঃ ১০/২৬)। সম্পূর্ণভাবে অধ্যাত্মবাদের দেশ হওয়া সত্ত্বেও আত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী চার্বাকের বস্তুবাদ এদেশে দর্শন হিসাবে মান্যতা লাভ করেছে। এবং এই কারণেই সর্বপ্রথম যৌনবিজ্ঞানের গ্রন্থ "কামসূত্র" এই ভারতের মাটিতেই রচিত হতে পেরেছে শুধু নয়, রচয়িতা বাৎসায়ন ঋষি হিসাবে শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন। মুক্তচিন্তার দেশ বলেই সবরকম উপদেশ দেবার পরও শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেননি যে, তাঁর উপদেশ মতই তাকে কাজ করতে হবে। বরং বলেছেন, "হে অর্জুন, আমি তোমাকে সব রকম উপদেশই দিলাম, এবার তুমি তোমার বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী কাজ কর" (গীঃ ১৮/৬৩)।

এতখানি চিন্তার উদারতা পাশ্চাত্য দেশে এক অকল্পনীয় ব্যাপার। প্রাচীন এথেন্সের মহা মহা পণ্ডিতরাও এব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত অসহিষ্ণু। এথেন্সবাসী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি তাদের থেকে উন্নত কোন ধ্যান ধারণার কথা বললে তাদের পক্ষে তা সহ্য করা সম্ভব হত না। এই কারণে অ্যানাক্সাগোরাস যখন বললেন যে চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই এবং সূর্যের আলোকে আলোকিত হয় এবং সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা করলেন, এথেন্সের পণ্ডিতদের পক্ষে তা সহ্য করা সম্ভব হল না। তারা অ্যানাক্সাগোরাসের বিচার করল এবং এথেন্স থেকে বিতাড়িত করল। এই এথেন্সের পণ্ডিতরাই প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে কথা বলার (বিশেষ করে অমানবিক ক্রীতদাস প্রথার সমালোচনা করার) জন্য সক্রেটিসকে বিষ খাইয়ে হত্যা করেছিল। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে এই বৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশন করার অপরাধে ধর্মান্ধ পাদ্রীরা ব্রুনোকে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে এবং গ্যালিলিওকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে। কিন্তু তার প্রায় একহাজার বছর আগে ঠিক একই কথা বলার জন্য ভারতবর্ষ আর্যভট্টকে সম্মানিত করেছে, পুড়িয়ে মারেনি। তবে সৌভাগ্য বশত কোপার্নিকাসের গ্রন্থ Revolutionibus যখন প্রকাশিত হয় তখন তিনি মৃত্যুশয্যায় এবং তার অল্প কয়েকদিন পরেই মারা যাবার ফলে এই

---

(১৪৫) প্রমাণাভাবান্ন তৎসিদ্ধি। সাঙ্খ্য ঃ (৫/১০)।

বর্বরদের অত্যাচার থেকে তিনি অব্যাহতি পান। বেশীদিন আগের কথা নয়, ১৬২৮ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী দার্শনিক ডেকার্টে পাদ্রীদের অত্যাচার (Persecution)-এর ভয়ে প্যারিস থেকে হল্যান্ডে পালিয়ে যান কারণ তখন হল্যান্ডের রাজা ধর্মান্ধতার বিরোধী ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর গ্রন্থ Le Monde প্রকাশ করতে ভয় পান কারণ তাতে তিনি বলেছিলেন যে, বিশ্ব অনন্ত ও পৃথিবী ঘুরছে। পাদ্রীদের অত্যাচারের ভয়ে স্পিনোজাকেও স্পেন থেকে হল্যান্ডে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। প্রথমে তাঁকে প্রতিমাসে ১০০ ফ্লোরিন করে ঘুষ দেবার প্রস্তাব করা হয় এবং তিনি অরাজী হলে প্রাণের ভয় দেখানো হয়। স্পিনোজা জন্মসূত্রে ইহুদী ছিলেন কিন্তু তিনি ইহুদী ও খ্রীস্টান দুইয়েরই রোষানলে পতিত হন, কারণ তিনি বলেছিলেন ঈশ্বর অনন্ত ও তাঁর গুণাবলী অসীম।

স্বাধীন ও মুক্তচিন্তায় হস্তক্ষেপ করার এই প্রবণতা পাশ্চাত্য আজও ত্যাগ করতে পারেনি। কমিউনিজমের বিরুদ্ধমত প্রচার করার অভিযোগে রাশিয়ায় কত লোককে যে হত্যা করা হয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। এই পাশ্চাত্য ভাবধারা অনুসরণ করলে অনেক আগেই বুদ্ধদেবকে বিষ খাইয়ে মারা উচিত ছিল এবং মহাবীরকে আগুনে পোড়ানো উচিত ছিল। স্বাধীনতার স্বর্গ বলে পরিচিত আমেরিকার কয়েকটি স্টেটে আজও ডারউইনের মতবাদ সেখানকার স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পড়ানো নিষেধ। প্রায় ৪০০০ বছর আগে গড শূন্য থেকে ছয় দিনের মধ্যে সব সৃষ্টি করেছেন, বাইবেল বর্ণিত এই তত্ত্বই সেখানে শেখানো হয়। আজও আমেরিকার কোন নাগরিকের পক্ষে এই সত্য কথা বলা সম্ভব নয় যে, কৃষ্ণকায় নিগ্রোরা সেখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক[(১৩৬)] অথবা সেখানে প্রতিযোগিতাহীন দানবরূপী একচেটিয়া পুঁজিবাদের রাজত্ব চলছে।

ভারতবর্ষ কোনদিন বুদ্ধিবৃত্তি বা চিন্তার দাসত্ব স্বীকার করেনি বলেই হিন্দু ঋষির পক্ষে বলা সম্ভব হয়েছিল যে, স্বয়ং ব্রহ্মাও যদি অযৌক্তিক কথা বলেন তবে তাঁকেও শুষ্ক তৃণের মতই পরিত্যাগ করবে। অথবা যে অন্ধভাবে শাস্ত্রবাক্য অনুসরণ করে সে অধার্মিক। যুগোপযোগী বাস্তব অবস্থার সঙ্গে শাস্ত্রবাক্য বিচার করে যে

---

(১৩৬) অল্প কয়েকদিন আগে রেজিনাল্ড ডেনি নামে এক নিগ্রোকে পুলিশ প্রকাশ্যে পিটিয়ে মেরে ফেলে। বিচারের সময় সেই অত্যাচারের ভিডিও টেপ দেখানো সত্ত্বেও আদালত দোষী শ্বেতকায়দের শাস্তি দেয় - Time 1.11.93

ধর্মানুসারে কাজ করে সেই ধার্মিক। এখানে কেউ কোনদিন বলেনি যে এই হল আল্লার বাণী বা স্বর্গস্থ পিতার বাণী, এর কোন পরিবর্তন চলবে না। তাই এদেশের শাস্ত্র এক জায়গায় বসে থাকেনি বা স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হয়নি। অনাদি কাল থেকেই এদেশে ধর্মাচরণের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়ে এসেছে। পুরাকালে বৈদিক ধর্ম ছিল কর্মপ্রধান। যাগযজ্ঞের আচার, মন্ত্র, নিয়ম-কানুনের উপরই জোর দেওয়া হত। যজমানের কতটা ভক্তি আছে বা না আছে সেটা বিচার্য ছিল না। পুরোহিত শাস্ত্রোক্ত নিয়ম অনুযায়ী কর্মকাণ্ড সমাধা করলেই ঈপ্সিত ফল পাওয়া যাবে। এমন কি নির্ভুলভাবে মন্ত্র উচ্চারণও এই কর্মকাণ্ডের অঙ্গ বিবেচিত হত। বিধিসঙ্গত কাজ না হলে যজ্ঞ তো পণ্ড হবেই এমন কি বিপরীত ফল হবে এই আশঙ্কা করা হত। ক্রমে এইসব জটিল কর্মকাণ্ডের বদলে আরণ্যক ও উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্ব প্রাধান্য লাভ করল। আগে পুণ্য অর্জনের দ্বারা স্বর্গলাভ করার যে অন্তিম লক্ষ্য ছিল মোক্ষ বা মুক্তি সেই স্থান দখল করল। কিন্তু তখনও ভক্তির আগমন হয়নি। অবশ্য উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্বের মধ্য থেকেই যে ভক্তিতত্ত্বের আবির্ভাব হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। এর প্রমাণ পাওয়া যায় যখন কঠোপনিষদের ঋষি বলেন, "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষআত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম।। (১/২/২৫) অর্থাৎ মেধা, বেদপাঠ বা শাস্ত্রশ্রবণের দ্বারা আত্মাকে জানা যায় না। যাহার প্রতি ইনি অনুগ্রহ করেন একমাত্র তিনিই ইহাকে লাভ করেন, তাহার কাছেই আত্মা তাঁর স্বীয় রূপ প্রকট করেন"। এই অনুগ্রহই পরবর্তীকালে ভক্তিশাস্ত্রের "কৃপা" নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে।

শ্রীমদ্ভাগবৎ ও পুরাণ সাহিত্য ভক্তি প্রধান। এমন কি যে গীতাকে হিন্দু ধর্মের সার বলা হয় তারও মূল প্রতিপাদ্য ভক্তি। "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োসি মে।। (১৮/৬৫), ভক্তি মার্গের এই শেষ কথা গীতাতেই আছে। অথচ গীতাকে ভারতীয় দর্শন, যোগ, এবং উপনিষদেরও সার বলা হয়। "সমস্ত উপনিষদরূপ গাভীকে দোহন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভারতবর্ষকে গীতামৃত পান করিয়েছেন"। কাজেই গীতায় ভক্তিকে সকলের উপরে স্থান দিয়ে স্বয়ং ভগবান ভক্তিমার্গকে সমস্ত সাধনমার্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করে গেছেন[১৪৭]। কিন্তু তখনও মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল কিনা বলা শক্ত

(১৪৭) এই প্রসঙ্গে বলা চলে যে শঙ্কর অদ্বৈতবাদী হলেও ভক্তিবাদই প্রচার করে গেছেন। তাঁর মঠে সারদা দেবদেবীর প্রতিষ্ঠাই তা প্রমাণ করে।

(মনুঃ ৪/১৩০,১৫৩)। ইতিমধ্যে ঋগ্বেদের, দেব দেবী, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, উষা ইত্যাদিরা তাঁদের প্রাধান্য হারিয়ে ফেলেছেন এবং সেই স্থানে শিব ও বিষ্ণুর পূজা প্রাধান্য লাভ করেছে। যে অবতারবাদ ও পুণর্জন্মবাদ ঋগ্বেদে ছিল না, উপনিষদ ও পুরাণের মাধ্যমে তাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাজেই যুগের প্রয়োজনে সংস্কৃত হবার ফলে সনাতন ধর্ম সর্বদাই যুগোপযোগী। এককালে, মনু বলেছেন শিক্ষাদান করা শুধু ব্রাহ্মনের কাজ। সেই অনুসারে আজ যদি কেউ বলেন যে স্কুল কলেজে শিক্ষকের চাকুরী শুধু ব্রাহ্মণরাই পাবে, তাহলে তিনি অবশ্যই হাস্যাস্পদ হবেন। মনুর সময় যে আসুর ও পৈশাচ বিবাহ প্রচলিত ছিল আজ কেউ তা করলে তাকে নির্ঘাত হাজৎ বাস করতে হবে। অথবা মনু বলেছেন যে ৩০ বছরের যুবক ১২ বছরের কন্যাকে পত্নী হিসাবে গ্রহণ করবে। কিন্তু আজ তা কেউ করলে নাবালিকা হরণের দায়ে জেল খাটতে হবে।

আধুনিক বিজ্ঞান ও ভারতীয় ভাবধারা ঃ

বিখ্যাত মার্কিন দার্শনিক John Dewey এর মতে বর্তমান বিজ্ঞানের কোন মূল ভিত্তি নেই। যেটা কাজ করছে সেটাই বিজ্ঞান এবং সময়ের সাথে বিজ্ঞানের সেই তত্ত্বও নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। যদি দেখা যায় যে কোন সদ্য আবিষ্কৃত ঘটনাকে সেই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারছে না তাহলে তা পরিত্যক্ত হয়। যদি কোন নতুন তত্ত্ব সেই ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয় তবে সেই নতুন তত্ত্বকেই সত্য বলে ধরা হয়। নিউটন যখন তাঁর মহাকর্ষ তত্ত্ব প্রচার করলেন তখন তা নিয়ে বিশাল হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল, মনে করা হল সেটাই সত্য। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্ব দিয়ে প্রমাণ করলেন যে, কেউ কাউকে আকর্ষণ করে না; বস্তুর আপেক্ষিক গতির জন্যই ঐ রকম অনুভূত হয়। বিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত নিউটনের গতি তত্ত্ব ছিল অভ্রান্ত সত্য এবং এই গতি তত্ত্বের মধ্যে কার্য কারণ সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল স্থূল ব্যাপারে নিউটনের তত্ত্ব কাজ করলেও পরমাণুর গঠন ইত্যাদি সূক্ষ্ম ব্যাপারে তা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ। ১৯২৫ ও ১৯৩০ সালে হেজেনবার্গ ও শ্রয়েডিঙ্গার দ্বারা আবিষ্কৃত কোয়ান্টাম তত্ত্ব ঐ সব সূক্ষ্ম ঘটনা মোটামুটি ভাবে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হওয়ায় বর্তমান বিজ্ঞানীরা তাকেই সত্য বলে মনে করেন। কিন্তু দেখা গেল যে, নতুন এই কোয়ান্টাম তত্ত্ব কার্য কারণ সম্বন্ধ মেনে চলে না। এই কারণে সংখ্যা তত্ত্বের দ্বারা নির্ধারিত তাৎক্ষণিক গড় কেই কোন বিশেষ কার্যের কারণ হিসাবে ধরা হয়। ভাবতে অবাক লাগে যে, আজ বিজ্ঞানীদের পরীক্ষাগারে যে সত্য ধরা পড়েছে, বহু হাজার বছর আগে ভারতের ঋষি কপিল যুক্তি ও উপলব্দির দ্বারা যে জ্ঞান আয়ত্ব করে বলেছিলেন যে ক্ষণবাদে কার্য কারণ সম্বন্ধ থাকে না।[১৪৮]

যারা বর্তমান পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচিত নন তারা প্রায় সকলেই এমন একটা ধারণা মনে পোষণ করেন যে বিজ্ঞান সব করতে পারে। এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে তারা একটা কুসংস্কারে ভোগেন যাকে বলা যেতে পারে আধুনিক বিজ্ঞানের কুসংস্কার। কিন্তু তারা শুনলে বিস্মিত হবেন যে, জোড়াতালির উপর ভিত্তি করেই বর্তমান বিজ্ঞান চলছে। একটা উদাহরণ দিলে ব্যপারটা পরিষ্কার

---

(১৪৮) যুগপজ্জায়মানয়োর্ণ কার্য্যকারণভাবঃ- (সাংখ্য ঃ ১/৩৮)

হবে। আলোর প্রকৃত স্বরূপ কি তা বিজ্ঞানীদের কাছে আজও অজ্ঞাত। আলোকে কখনও মনে হয় তরঙ্গের স্রোত আবার কখনও মনে হয় কণার স্রোত। বিজ্ঞানীরাও যখন যেমন প্রয়োজন, কখনও তরঙ্গ কখনও বা কণা ধরে নিয়ে কার্যসিদ্ধি করেন। সেই রকম কতগুলি পারমাণবিক বিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে বিজ্ঞানীদের নিউট্রিনো নামে এক ক্ষুদ্র কণার সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই নিউট্রিনো কণার স্বরূপও বিজ্ঞানীদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কারণ বৈজ্ঞানিক তথ্যপ্রমাণের দ্বারা দেখা যায় যে এই কণা বাস্তব কিন্তু ভর (mass) শূন্য।

অনেকে আবার মনে মনে এই ধারণা পোষণ করেন যে, আজ হয়তো বিজ্ঞান অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হচ্ছে কিন্তু ভবিষ্যতে সে সবই ব্যাখ্যা করতে পারবে। তাঁরাও শুনে অবাক হবেন যে হেজেনবার্গের অনিশ্চয়তা (uncertainty) তত্ত্ব বলছে যে একটা নির্দিষ্ট সূক্ষ্মতার নীচে মানুষ কোন দিনই কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে পারবে না এবং ঐ সূক্ষ্মতার চেয়ে সূক্ষ্মতর সমস্ত বৈজ্ঞানিক ঘটনা মানুষের কাছে চিরকালের মত অজ্ঞাতই থেকে যাবে। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে ডাচ বিজ্ঞানী বোর (Bohr) প্রথম তত্ত্ব দিলেন যে পরমাণুর গঠন অনেকটা সৌর জগতের মত। পরমাণুর কেন্দ্র বা nucleus পরমাণুর কেন্দ্রে রয়েছে এবং ইলেকট্রনগুলো কক্ষপথে তার চারিদিকে ঘুরছে। কিন্তু এই কক্ষপথগুলি বৃত্তাকার না উপবৃত্তাকার, বা ঐ রকম কোন কক্ষপথ আদৌ আছে কি না বিজ্ঞানীদের কাছে তা অজ্ঞাত এবং চিরকালের মত অজ্ঞাতই থেকে যাবে। কারণ কক্ষগুলির গতিপথ নির্ণয় করতে যে সূক্ষ্মতার দরকার তা মানুষের সাধ্যের বাইরে। বিজ্ঞানে এ রকম বহু ঘটনা আছে যা মানুষ কোনদিনই জানতে পারবে না। এই প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটা শ্লোক স্মরণ করা যেতে পারে—

হিরণ্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। (৫/১৫/১)

অর্থাৎ "হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যব্রহ্মের স্বরূপটি আবৃত রহিয়াছে"। এই আবরণই কি শঙ্করের মায়া? যদি তাই হয় তবে পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানের পক্ষে সেই মায়ার আবরণ ভেদ করে সত্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব নয় কারণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হেসেনবার্গের অনিশ্চয়তা তত্ত্বই সেই মায়াময় আবরণ। তাই হয়ত আমাদের ঋষি বলে গেছেন,

যদর্চিমদ্ যদণুভ্যোঽনু চ যস্মিল্লোঁকা নিহিতা লোকিনশ্চ।
তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদু বাঙমনঃ।
তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি।।

(মুণ্ডক-২/২/২)

অর্থাৎ "যিনি দীপ্তিমান, যিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, যিনি স্থূল হইতে স্থূল, যাহাতে লোকসমূহ এবং লোকবাসিগণ অবস্থিত, তিনি সর্বাস্পদ অক্ষর ব্রহ্ম। তিনিই প্রাণ, তিনিই বাক ও মন। সেই ব্রহ্মাই সত্য, সেই ব্রহ্মাই অমৃত। হে সৌম্য তাহাকেই ভেদ করিতে হইবে, তাহাকেই ভেদ কর।" কিন্তু পাশ্চাত্যের জড় বিজ্ঞানের কি ভেদ করার সেই ক্ষমতা আছে? কারণ

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যের্দেবৈস্তপসা কর্মনা বা। (ঐ ৩/১/৮) বা "তিনি চক্ষুদ্বারা গৃহীত হন না, বাক্যের দ্বারাও নহেন। অপর ইন্দ্রিয়গণের দ্বারাও তিনি গৃহীত হন না ..."।(১৪৯)

প্রকৃতপক্ষে তিরিশের দশকের পর থেকে বিজ্ঞানের কোন মৌলিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়নি। আজ যা হচ্ছে তা হল ঐ সমস্ত মূল তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে যান্ত্রিক বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা প্রয়োজন। এই শতাব্দীর গোড়াতেই নিউটনের কার্য-কারণ সমন্বিত গতিতত্ত্বের বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বের মর্যাদা হারিয়েছে এবং বর্তমানে শুধু অত্যন্ত স্থূল ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করার তত্ত্ব মেকানিক্স্-এ পর্যবসিত হয়েছে। নিউটনের উপরিউক্ত তত্ত্বের উপরই মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের ভিত্তি নিহিত রয়েছে যা মার্ক্সের বন্ধু ফ্রেডারিক এঙ্গেল্স্ তাঁর Dialectics of Nature গ্রন্থে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কাজেই যে সমস্ত ব্যক্তিরা মার্ক্সের তত্ত্বকে সর্বাপেক্ষা বৈজ্ঞানিক বলে আকাশ-বাতাস মুখরিত করছেন তাঁদের জেনে রাখা ভাল যে, যে বিজ্ঞানের উপর মার্ক্সবাদের সৌধ দাঁড়িয়ে আছে সেই বিজ্ঞান বহুদিন আগেই পরিত্যক্ত হয়েছে।

---

(১৪৯) ভোগ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সাধ্য, তাই ভোগের দ্বারা সেই পরম পুরুষকে জানা অসম্ভব। অতএব "ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্ব মানশুঃ", ত্যাগের দ্বারাই তাকে জানতে হবে।

পাশ্চাত্য আজ নিজেই বিভ্রান্ত ঃ

বিজ্ঞানের মত পাশ্চাত্যের দর্শন এবং রাজনৈতিক মতবাদও আজ জোড়াতালির উপর চলছে। হিন্দু যেমন বলতে পারে ধর্মাশ্রিত জীবন যাপন করার মধ্য দিয়ে অর্থ ও কাম পুরুষার্থ চরিতার্থ করে অন্তিমে মোক্ষলাভই মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য এবং এই মূল সত্য অনুসারেই মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, সমাজজীবন, ধর্মজীবন, রাষ্ট্রজীবন পরিচালিত করতে হবে এবং এই লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাষ্ট্রব্যবস্থা সমাজব্যবস্থা প্রবর্তিত করতে হবে, পাশ্চাত্যের পক্ষে তেমন করে বলা সম্ভব নয় যে, হ্যাঁ এটাই আমাদের মূল সত্য। তারা আজ এক তত্ত্বকে সত্য বলে গ্রহণ করে আবার কয়েক বছর বাদে সেই তত্ত্বকে পরিত্যাগ করে নতুন কোন তত্ত্বকে সত্য বলে গ্রহণ করে। তারা আজ অন্ধকারে সাময়িক বা ক্ষণস্থায়ী সত্য হাতড়ে হাতড়ে যে মূল সত্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে, আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে ভারতের ঋষি সেই সত্য আবিষ্কার করে, তাকে কার্যে পরিণত করে মানবজাতির কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, আজ থেকে মাত্র আড়াই হাজার বছর আগে, গৌতম বুদ্ধের সময় যখন পাশ্চাত্যের গ্রীস দেশে সভ্যতার উন্মেষ হয় তখন ভারতে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র রচিত হচ্ছে, এবং বেদ, উপনিষদ, মহাকাব্য ইত্যাদির মাধ্যমে ভারতের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনা তখন পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। কাজেই সেই সময়কার গ্রীক মনিষীদের চিন্তা ভাবনা শৈশবের স্তরে ছিল বটে কিন্তু পরবর্তী সেমিটিক ধর্মমতগুলির মত অতটা স্থূল ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ বিশ্বসৃষ্টির কথা বলা যেতে পারে।

ইহুদী ও খ্রীস্টধর্মমতে ঈশ্বর ছয়দিনের মধ্যে, শূন্য থেকে এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। এ ব্যাপারে প্ল্যাটোর মত হল ঈশ্বর মাটি, জল, বাতাস ও আগুন এই চার উপাদান দিয়েই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। কাজেই হিন্দুর পঞ্চভূত, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম-এর সঙ্গে প্ল্যাটোর ধারণার মিল পাওয়া যায় এবং তিনি শুধু ব্যোম বা শূন্যকে বাদ দিয়েছেন। হয়ত হিন্দুর মত তৎকালীন গ্রীকরাও এই মত পোষণ করত যে, অবস্তু বা শূন্য থেকে বস্তুময় জগতের উৎপত্তি সম্ভব নয়—নাবস্তুনো বস্তুসিদ্ধিঃ (সাঙ্খ্যঃ ১/৭৮)। প্ল্যাটো বলেছেন যে, এই বিশ্ব যেহেতু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাই তা শাশ্বত নয় এবং সৃষ্টি ও ধ্বংস আছে। ঈশ্বরই এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি

ইচ্ছা করলেন যে, সব জিনিস উত্তম হোক—এইভাবে তিনি বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়ন করলেন এবং এর ফলেই বিশ্ব সৃষ্টি হল। কাজেই ঈশ্বর শূন্য থেকে বিশ্ব সৃষ্টি করেননি, সৃষ্টির উপাদান, ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ আগে থেকেই ছিল, তিনি শুধু তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন। এর সঙ্গে হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গীর মিল পাওয়া যায় কারণ সাঙ্খ্য মতে সত্ত্ব, রজঃ, তম এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি এবং প্রকৃতিই জগৎ সৃষ্টির কারণ (প্রকৃতি থেকে পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চতন্মাত্র থেকে স্থূল পঞ্চভূত উৎপন্ন হয়— সাঙ্খ্য ঃ ১/৬১,৬২)। এবং এই প্রকৃতি অমূল ও নিত্যা (সাঙ্খ্য ঃ ১/৬৭)। তফাত শুধু এই যে, প্ল্যাটোর মতে এই সুবিন্যস্ত করার কাজে ঈশ্বরের প্রয়োজন, কিন্তু সাঙ্খ্য মতে প্রকৃতি কাল ধর্মের বশে (৩/৬০), বা দুধ যেমন আপনা আপনি জমে দই হয় সেই রকম আপনা আপনি পুরুষ ভোগার্থে জগৎ সৃষ্টি করে (৩/৫৮)।[১৫০]

দৃশ্যমান জগতে কিছু কিছু অসঙ্গতি ও ত্রুটি দেখা যায়, কিন্তু প্ল্যাটোর মতে এর থেকে বিশুদ্ধ ও ত্রুটিমুক্ত বিশ্ব সম্ভব নয় কারণ ঈশ্বর যেহেতু সব রকম দোষত্রুটিমুক্ত তাই তিনি যতটা পেরেছেন বিশ্বকে ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। এবং নিপুণ ঈশ্বরের সৃষ্টি বলেই তা কোনদিন জরা ও ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হবে না। ঈশ্বর প্রথমে আত্মা সৃষ্টি করেন এবং তাকে দেহের মধ্যে স্থাপন করেন এবং বুদ্ধিকে আত্মার মধ্যে স্থাপন করেন। ঈশ্বর কিছু আত্মাকে পৃথিবীতে রেখেছেন ও বাদবাকীদের সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ও অন্যান্য গ্রহদের মধ্যে স্থাপন করেছেন[১৫১]। কিন্তু প্ল্যাটোর ঈশ্বর প্রাকৃতিক গুণ সম্পন্ন ও ত্রিগুণাতীত নিরাকার নন বলে তিনি জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার অভিন্নতা দেখতে পাননি। তবে হিন্দুর শাশ্বত সর্বব্যাপী ব্রহ্ম বা পরমাত্মার মত এক সত্তার অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাস করতেন এবং তাই বলেছেন, "There is one kind of being which is always the same, uncreated and indestructible, never receiving any thing into itself from without, nor itself going out of any other, but invisible and imperceptible by any sense and of which the contemplation is granted to

(১৫০) সত্ত্ব, রজঃ ও তম গুণ থেকে পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চতন্মাত্র থেকে পঞ্চভূতের সৃষ্টি বর্তমান বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। আধুনিক বিজ্ঞান মতে শক্তির বস্তুতে এবং বস্তুর শক্তিতে রূপান্তর সম্ভব। এই তত্ত্বই আণবিক শক্তির উৎস। বিস্ময়ের ব্যাপার যে কত হাজার বছর আগে আমাদের ঋষি তা ধ্যানের দ্বারা মানস নয়নে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

(১৫১) পাঠক এখানে বৃহদারণ্যক উপনিষদের "সঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ ..." (৩/৭/৩)-এর সঙ্গে মিল দেখতে পারেন।

intelligence only." এর সঙ্গে পাঠক "এষসর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ ইত্যাদি," মাণ্ডুক্যোপনিষদের ৬ষ্ঠ শ্লোক এবং "ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা ইত্যাদি" (মুণ্ডকঃ ৩/১/৮)-এর সঙ্গে মিল খুঁজে পেতে পারেন। আত্মার অবিনাশিতা ও পুনর্জন্ম সম্বন্ধে প্ল্যাটোর কিছু কিছু চিন্তা-ভাবনার কথা আগেই বলা হয়েছে।

প্ল্যাটোর মত অ্যারিস্টটলের বিশ্বও ক্ষিতি, অপ, তেজ (আগুন) ও মরুৎ দিয়ে তৈরী এবং সসীম। চন্দ্রমণ্ডলের নীচে যা কিছু আছে তা পরিবর্তনশীল কিন্তু চন্দ্র ও সূর্য মণ্ডলের উপরে যা কিছু আছে সবই অপরিবর্তনীয় ও অবিনশ্বর। অ্যাবিস্টটলের এই ধারণা ইয়োরোপ মধ্যযুগ পর্যন্ত অভ্রান্ত মনে করত। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে বিজ্ঞানীরাও বিভ্রান্ত হতেন। কিন্তু ১৫৭২ সালে ডাচ জ্যোতির্বিদ টাইকো ব্রাহে আকাশে একটা nova বা নতুন নক্ষত্র আবিষ্কার করলে উপরিউক্ত ধারণার প্রতি সর্বপ্রথম সকলের সন্দেহ উপস্থিত হয় এবং কালক্রমে তা পরিত্যক্ত হয়। অ্যারিস্টটলের মতে সময়ের কোন সৃষ্টি ও বিনাশ নেই এবং সেইরকম বস্তুর গতিও চিরন্তন। এই গতিকে সাঙ্খ্যের রজঃ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। গতিহীন একজন চালক (unmoved mover) এই গতিশীল বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং তিনিই গ্রহদের বৃত্তাকারে কক্ষপথে চালিত করছেন। এ প্রসঙ্গে বলে নেওয়া ভাল যে, যে কোপার্নিকাসকে সূর্যকেন্দ্রিক সৌরমণ্ডলের আবিষ্কর্তা বলা হয়, তার প্রায় ২০০০ বছর আগে সামোয়ার অ্যারিস্টারকাস সূর্যকেন্দ্রিক গ্রহমণ্ডলীর কল্পনা করেছেন। অ্যারিস্টারকাসের তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই অ্যানাক্সাগোরাসের পক্ষে বলা সম্ভব হয়েছিল যে চন্দ্রের নিজস্ব আলো নেই এবং তা সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়। উপরন্তু অ্যারিস্টারকাসের তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই তিনি সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে পিথাগোরাসের একটা ধারণার কথা উল্লেখ করা যুক্তিযুক্ত হবে। তিনি মনে করতেন যে, ঈশ্বর এক স্বর্গীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে গ্রহদের চালাচ্ছেন, তাই সূর্য থেকে গ্রহদের দূরত্ব কখনই এলোমেলো হতে পারে না, বা বেসুরো হতে পারে না। যে যে দৈর্ঘ্যের অনুপাতে একটা তার থেকে সুর নির্গত হয়, গ্রহরাও সূর্য থেকে সেই সেই আনুপাতিক দূরত্বে রয়েছে।

অ্যারিস্টটলের মতে সুখই (happiness) উত্তম, যা নাকি আত্মার ক্রিয়া। মানুষের আত্মা দুই ভাগে বিভক্ত, বিবেকী ও অবিবেকী। সম্ভবত আত্মার দুই ভাগ দ্বারা তিনি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির কথা বলতে চেয়েছেন, কারণ বলছেন

যে, এই কারণে মানুষের গুণও দুই রকমের হয়, বৌদ্ধিক ও নৈতিক। তাঁর মতে শ্রেষ্ঠ মানুষ হল সেই, যার মধ্যে উপযুক্ত পারিমাণে গর্ব আছে এবং যে নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতাকে কখনও নিচু করে দেখে না, অর্থাৎ যে বিনয়ী নয় বরং যথেষ্ঠ অহঙ্কারী। এই কারণে পরবর্তীকালে জার্মান দার্শনিক নিৎসে অ্যারিস্টটলের সমর্থক ছিলেন এবং খ্রীস্টধর্মের অতি মাত্রায় বিনয়ী মনোভাব, যথা কেউ এক গালে চড় মারলে অন্য গাল পেতে দেবে এই উপদেশকে, দাসসুলভ বলে মনে করতেন। তৎকালীন ক্রীতদাসদের প্রতি অ্যারিস্টটল ছিলেন বেশ কঠোর। তিনি তাদের জীবন্ত যন্ত্র ও মালিকের সম্পত্তি বলে মনে করতেন।

যাই হোক পরবর্তীকালে খ্রীস্টধর্মের প্রসারের সাথে সাথে উপরিউক্ত গ্রীক চিন্তা-ভাবনার অবসান ঘটে এবং খ্রীস্টধর্মের মাধ্যমে সমগ্র ইয়োরোপ ঈশ্বর, বিশ্ব ও তার সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত স্থূল সেমিটিক ধ্যান-ধারণায় অভ্যস্থ হয়ে ওঠে। ইয়োরোপ তখন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দেখেছে শুধু স্বেচ্ছাচারী ধর্মান্ধতা, পোপের নিয়ন্ত্রণে স্বেচ্ছাচারী রাজাদের শাসন এবং ধর্মের নামে নির্যাতন ও পৈশাচিক নরহত্যা। অবশেষে রেনেসাঁ ও রিফর্মেশনের মধ্য দিয়ে দীর্ঘস্থায়ী অন্ধকারময় যুগের অবসান হলে পুনরায় নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু হয়, ইতিহাসে যাকে জ্ঞানোন্মেষের যুগ বলা হয়। কিন্তু তখনও স্বাধীন চিন্তার কোন অবকাশ ছিল না। বহু বাধা নিষেধের মধ্য দিয়েই তৎকালীন দার্শনিকদের অগ্রসর হতে হয়েছে। প্রথমত খ্রীস্টান ধর্মীয় মতের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা যাবে না, দ্বিতীয়ত স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের বিরুদ্ধে কোন কথা বলাও তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না বা বললেও অনেক চিন্তাভাবনা করেই তা বলতে হত। এই সময়কার দার্শনিকদের দুটো ব্যাপার নিয়ে খুব ব্যস্ত হতে দেখা যায়। প্রথমত খ্রীস্টধর্মের স্থূল ঈশ্বর ও বিশ্বভাবনার সঙ্গে নবাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহের সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে গলদ্‌ঘর্ম হওয়া; দ্বিতীয়ত প্রজাপীড়নকারী রাজতন্ত্র ও পোপতন্ত্রের হাত থেকে মুক্তির পথ অন্বেষণ করা।

সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী গণিতজ্ঞ রেনি ডেকার্টেকেই বর্তমান যুগের প্রথম দার্শনিক বলে মান্য করা হয়। তাঁর মতে একমাত্র মানুষেরই আত্মা আছে। ইতর প্রাণীদের চলাফেরা যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয় এবং তাদের কোন আত্মা নেই, মানুষের আত্মা ও জৈবিক ক্রিয়া ভিন্ন সত্ত্বা কিন্তু সম্বন্ধযুক্ত। বিশ্বের সামগ্রিক গতির কোন পরিবর্তন নেই, তাই আত্মা দেহের জৈবিক গতির পরিমাণগত কোন পরিবর্তন

করতে পারে না, শুধু দিক পরিবর্তন করতে পারে। এইভাবেই আত্মা মানুষের জৈবিক গতি নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ ডেকার্টের মতে মানুষ এবং ইতর প্রাণী সবাই এক একটি যন্ত্র বিশেষ। আত্মা মানুষ-যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু পশু-যন্ত্রের কাজ কর্ম আপনা-আপনি বা কোন জাড্যের প্রভাবে হয়। অনেক সময় মনে হয় যে, ডেকার্টে যেন মানুষের বুদ্ধি বা ধীশক্তিকেই আত্মা বলতে চাইছেন। উপরিউক্ত ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত মনে হয় যখন তিনি বলেন যে, মানুষের দুই ভাগ — শরীর ও মন। উপরন্তু তিনি যখন বলেন যে আমি চিন্তা করি তাই আমি আছি, তখন মনে হয় যে শরীরের বাস্তব অস্তিত্ব থেকেই তিনি মনকে বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন। মনের সঙ্গে আত্মার কি সম্পর্ক তা তাঁর বক্তব্যের মধ্যে স্পষ্ট নয় এবং পশুদেরও মন আছে কিনা তার স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। ডেকার্টে মনে করতেন যে, প্রতিনিয়ত সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণির সৃষ্টি হচ্ছে এবং এই ঘূর্ণিই গ্রহদের চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

আগেই বলা হয়েছে যে, "একমাত্র বাইবেলেই সত্য আছে" এই সিদ্ধান্তকে মান্য করাই ছিল সেই সময়কার চিন্তাবিদ্‌দের প্রাথমিক শর্ত। তাই স্পিনোজা যখন বললেন যে ঈশ্বর অনন্ত ও তার গুণাবলী অসীম, খ্রীস্টান ধর্মযাজকরা তার উপর অপ্রসন্ন হলেন এবং তাঁকে হল্যান্ডে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করতে হল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে স্পিনোজাও, প্ল্যাটোর মতই এক অখণ্ড absolute Being-এর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন এবং বলতেন যে, ভিন্ন ভিন্ন বস্তু ও ভিন্ন ভিন্ন আত্মা সব সেই একেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। ঠিক যেন "একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ" (কঠঃ ২/২/৯)। কিন্তু লিবনিৎসের ঈশ্বর পুরোপুরি বাইবেলের গড। বিশ্বের বাইরে অবস্থিত অ্যারিস্টটলের unmoved mover-এর জায়গায় তাঁর ঈশ্বর হলেন uncaused cause. তিনি সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ এবং মানুষকে তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। এই সিদ্ধান্ত এইজন্য যে, মানুষ যদি স্বাধীন না হয়ে ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে সে পাপ করবে কেমন করে? আর ঈশ্বরই তাকে পুণ্যের জন্য পুরস্কার এবং পাপের জন্য শাস্তি দেবেন কেমন করে? কাজেই মানুষকে স্বাধীনতা দিলে খ্রীস্টধর্মের পাপের তত্ত্ব অচল হয়ে পড়ে। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন দাঁড়ায়—ঈশ্বর যেহেতু সর্বজ্ঞ তাই তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে মানুষকে স্বাধীনতা দিলেই সে পাপ করবে। তবুও তিনি স্বাধীনতা দেন কেন? লিবনিৎসের বক্তব্য হল, মানুষ পাপ করবে জেনেও ঈশ্বর মানুষকে স্বাধীনতা দেন, আদম জ্ঞানবৃক্ষের ফল

খেয়ে পাপ করবে জেনেও ঈশ্বর আদমকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে যে, ঈশ্বর জেনে-বুঝেই মানুষকে পাপের পথে ঠেলে দেন, আবার পাপের জন্য সাজা দেন, এই blackmailing করেন কেন?

ইতিমধ্যে ইয়োরোপের সমাজজীবনে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে। প্রথমত পোপ ও সেই সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় যাজকদের প্রতাপ ক্ষুন্ন হয়েছে এবং খ্রীস্টান জগৎ ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট এই দুই শিবিরে ভাগ হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত চার্চের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হবার ফলে ইয়োরোপের বিভিন্ন রাজশক্তি হয়ে উঠেছে অত্যন্ত স্বৈরাচারী এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে শুরু হয়ে গেছে স্বার্থের নগ্ন রাজনীতি। এই সব রাজাদের স্বৈরাচারী হবার পিছনে বাইবেল কিভাবে ইন্ধন যুগিয়েছে তা আগেই বলা হয়েছে। কাজেই আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনার বদলে এই সময়কার চিন্তাবিদ্‌দের সামনে প্রশ্ন দাঁড়াল (১) রাষ্ট্র কেমন হওয়া উচিত, (২) রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের কি সম্বন্ধ হওয়া উচিত, (৩) ব্যক্তিগত স্বার্থ বড় না সমষ্টিগত বা রাষ্ট্রস্বার্থ বড়, (৪) ব্যক্তি বিশেষ কতখানি স্বাধীনতা ভোগ করার উপযুক্ত এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে চার্চের সম্বন্ধ কেমন হওয়া উচিত। এই অনুসারে দার্শনিকরাও প্রধানতঃ তিনদলে ভাগ হয়ে গেলেন। প্রথম দলে থাকলেন হব্‌স্‌, রুসো, হেগেল ইত্যাদিরা, যাদের মতে রাষ্ট্রের স্বার্থ সবার উপরে। এই মতে বিশ্বাসী রাজনীতিকরা হলেন নেপোলিয়ন, ক্রমওয়েল ইত্যাদিরা। পরবর্তীকালে এই মতের উপর ভিত্তি করেই মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটল।

দ্বিতীয় দলে রইলেন কার্লাইল, নিৎসে ইত্যাদি দার্শনিকরা, যাদের মতে ব্যক্তিই সবার উপরে, ব্যক্তিই ইতিহাস তৈরি করে। এই মত ধরেই আবির্ভূত হলেন হিটলার ও মুসোলিনির মত একনায়কতন্ত্রবাদীরা। তৃতীয় দলে থাকলেন লক্‌, মিল, বেন্থাম ইত্যাদি মধ্যপন্থায় বিশ্বাসীরা, যাদের বলা হয় লিবারাল। এঁরা ব্যক্তিস্বার্থ ও রাষ্ট্রস্বার্থের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করলেন এবং ইংল্যান্ড ও হল্যান্ডে এই মত জোরদার হল। এই লিবারাল মতবাদ থেকেই জন্ম নিল বর্তমান সংসদীয় গণতন্ত্র।

কাজেই উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার হয় যে ইয়োরোপের দার্শনিক চিন্তাভাবনার মধ্যে আধ্যাত্মবাদের স্থান খুবই নগণ্য। অতীতে গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যেই যৎসামান্য আধ্যাত্মিকতার স্ফুরণ হয়েছিল, কিন্তু খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে গ্রীস রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর তার অবসান হয়। তবে সেই সময়কার

গ্রীক দার্শনিকরা যে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হননি এ কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না কারণ আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের অনেক আগে থেকেই ভারত ও গ্রীসের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তার অনেক প্রমাণ আছে(১৫২)। এরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে পিথাগোরাসের সময় একদল হিন্দু পণ্ডিত এথেন্সের রাজসভায় গিয়েছিলেন এবং তাদের কাছ থেকেই পিথাগোরাস হিন্দুদর্শন, পুনর্জন্মবাদ, একেশ্বরবাদ ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হন।(১৫৩) জ্যামিতির বিখ্যাত উপপাদ্য, যা আজ পিথাগোরাসের উপপাদ্য নামে খ্যাত, তাও ঐ সময় তিনি বৌধায়নের শুল্বসূত্র থেকে জেনেছিলেন বলে পণ্ডিতরা মনে করেন।(১৫৩) আগের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে গ্রীক পণ্ডিতরা মানবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করলেও ঈশ্বরের সঙ্গে সেই মানবাত্মার সম্বন্ধ নির্ণয় করার বেলায় ব্যর্থ হচ্ছেন। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, ভারতীয় সর্বেশ্বরবাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও সেই সরল সমাধান তারা গ্রহণ করেন নি কেন? বর্তমান লেখকের বিশ্বাস যে, ক্রীতদাস প্রথার উপর তৎকালীন গ্রীক সভ্যতা নির্ভর করত বলে, ব্যক্তিগত কারণেই হোক বা রাষ্ট্রের চাপে পড়েই হোক, সর্বেশ্বরবাদের মত উদার মতবাদ তাদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। মুখে বলব "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" আর কাজের বেলায় ক্রীতদাসদের পশুর মত খাটিয়ে মারব, দুটো একসঙ্গে চলতে পারে না।

কাজেই প্রাচীন গ্রীসের কতিপয় মনীষীর কিছু কথাবার্তা বাদ দিলে পাশ্চাত্য দর্শনে যা পড়ে থাকল তা নিতান্ত জাগতিক বিষয়ের আলোচনা, বাস্তব সমস্যাকে সমাধান করার উপায় অন্বেষণ করা। তাই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মত পাশ্চাত্যের বর্তমান দর্শনের উদ্দেশ্যও হল সাময়িক সমস্যাকে ঠেকা দেওয়া, মূল মানবিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজা নয়। হিন্দুর ধর্ম ও মোক্ষের মত নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য না থাকায় সেখানে নানা মুনির নানা মত। লক-এর মতে স্বাভাবিক ন্যায় নীতি বোধ(১৫৪) থেকেই রাষ্ট্রের আইন-কানুন রচিত হওয়া উচিত। কিন্তু বেন্থাম স্বাভাবিক বা স্বর্গীয় (অর্থাৎ বাইবেল বর্ণিত) আইন-কানুনের উপর ভরসা না করে সাধারণ মানুষের উপরই আইন রচনার

---

(১৫২) Advanced Hist. of India, R.C. Majumdar, p. 135.

(১৫৩) প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, পৃঃ- ৯৫

(১৫৪) এই স্বাভাবিক ন্যায় নীতিই হল হিন্দু "ধর্ম"। কাজেই এই কথা বলার সময় Loke-এর মনে হয় যে "ধর্ম" এর অস্পষ্ট ধারণা কাজ করেনি তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

দায়িত্ব অর্পণ করার পক্ষপাতী। যাই হোক, লক, মিল ও বেন্থামকে অনুসরণ করে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হল বটে কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই দেখা গেল যে, এই গণতন্ত্র সাধারণ মানুষকে যতটা স্বাধীনতা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা অসম্ভব হয়ে পড়ছে। লিবারালদের তত্ত্ব Laisses faire বা স্বাধীন ভাবে লুঠ করার নীতি ইতিমধ্যে জন্ম দিয়েছে প্রজাপীড়নকারী পুঁজিপতি শ্রেণীর যাদের নিয়ন্ত্রণ করা রাষ্ট্রক্ষমতার পক্ষে অসাধ্য। কাজেই ইয়োরোপ গণতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকতে থাকল এবং মার্ক্স যখন তার সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব উপস্থিত করলেন তখন পশ্চিম মনে করল এটাই পথ। কিন্তু মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের পতনের পর আজকের ইয়োরোপ কোন্ পথে যাবে? কোন্ পথকে সত্য বলে মানবে? কোন্ পথকে মানুষের মুক্তির পথ বলে নির্দেশ করবে? এই প্রশ্নের জবাব পশ্চিমের জানা নেই—ইয়োরোপ নিজেই আজ বিভ্রান্ত।[১৫৫]

কিন্তু কেন এই বিভ্রান্তি? এর কারণ দ্বিবিধ। প্রথমত পশ্চিম আজও খণ্ডিত মানুষকে বিচার করছে। একটা পূর্ণ মানুষকে বিচার করা আজও তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। দ্বিতীয়ত আজও তারা মানুষের মধ্যে দেবত্ব আবিষ্কার করতে পারছে না। মানুষ তাদের কাছে আজও একটা social animal, একটা ঘৃণিত পাপী ছাড়া আর কিছুই নয় এবং খ্রীস্টধর্মের স্থূল সেমিটিক দর্শন এর প্রধান অন্তরায়। তাই আজও তারা ডেমোক্রেসী, অ্যানার্কিসম্, অ্যানাব্যাপটিজম্, ফ্যাসিজম ও সোস্যালিজম-এর গোলক ধাঁধায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। পথ খুঁজে পাচ্ছে না। অথচ আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে ভারতের ঋষিরা চিরকালের মত এ সমস্যার সমাধান করে গেছেন এবং এই সমাধান বের করতে তাদের এত ইজমের প্রয়োজন হয় নি। রাজা ধর্মাশ্রয়ী হবে, রাষ্ট্র ধর্মাশ্রয়ী হবে এবং প্রজা ধর্মাশ্রয়ী হবে—এই এক কথায় সে সমাধান সূত্র চিরকালের মত নিশ্চিত হয়ে গেছে। এর থেকে বিচ্যুত হলে কোন ইজ্‌মই টিকতে পারবে না। এর থেকে বিচ্যুত হলে কোন ইজ্‌মই কল্যাণকারী হতে পারে না।

পশ্চিম যা কিছু চিন্তা করে সবই রাষ্ট্র-ক্ষমতা কেন্দ্রিক। তাদের গণতন্ত্র রাষ্ট্র-ক্ষমতা কেন্দ্রিক, তাদের ফ্যাসিজ্‌ম রাষ্ট্র-ক্ষমতা কেন্দ্রিক, তাদের সমাজতন্ত্র আরও

---

(১৫৫) ইয়োরোপ কি কার্লাইল ও নিৎসের হাত ধরে একনায়কতন্ত্রে ফিরে আসবে? বর্তমান জার্মানীতে নাৎসী পার্টির দ্রুত প্রসার এই সম্ভাবনারই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

প্রবলভাবে রাষ্ট্র-ক্ষমতা কেন্দ্রিক। অর্থাৎ পুলিশ ছাড়া অন্য কোনভাবে শান্তি রক্ষা করা যেতে পারে, পুলিশ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে এ ধারণা তাদের নেই। পশ্চিমের এই মনোবৃত্তি আজকের নতুন নয়, গ্রীসের নগর-রাষ্ট্র গুলির সময় থেকেই তা চলে আসছে। এর পেছনেও তাদের সেই মূল নীতি কাজ করে চলেছে—মানুষ একটি সামাজিক পশু এবং পাপী। কাজেই এরকম পশু ও পাপীদের অবশ্যই পুলিসের লাঠি দিয়েই শাসন করতে হবে। কিন্তু রাষ্ট্র-শক্তির উপর নির্ভর এবং রাষ্ট্র-শক্তি দ্বারা পুরোপুরি ভাবে নিয়ন্ত্রিত তাদের কোন ইজ্‌মই কি সাফল্য লাভ করতে পেরেছে? ফ্যাসিজম্‌, অ্যানার্কিজম্‌, সোস্যালিজম্‌ একের পর এক আসছে আর কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। যে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রসংসায় তারা পঞ্চমুখ তাও কতখানি সফল হয়েছে? একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কবলে পড়ে তাও আজ মৃত্যুর দিন গুনছে। এর কারণ কি? এর কারণ একটাই, মানুষের উপর বিশ্বাসের অভাব। মানুষ বিশ্বাসের যোগ্য নয় কারণ সে সামাজিক পশু ও পাপী। মানুষ যে নিজেই নিজেকে শাসন করতে, নিজেই নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, ধর্মাশ্রয়ী হতে পারে, এ বিশ্বাস তাদের নেই। কাজেই যা ইজ্‌ম্‌ সবই উপর থেকে চাপিয়ে দিতে হবে। স্বর্গস্থ পিতা স্বর্গ থেকে এই বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করেন, নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা বিশ্বের নেই, এটাই তাদের আদর্শ, এটাই তাদের মডেল।[১৫৫ক]

কিন্তু ভারতীয় আদর্শ এর সম্পূর্ণ বিপরীত। "যাহা পিণ্ডে তাহাই ব্রহ্মাণ্ডে" এই হল ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী। যে নিয়মে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুপরমাণু নিয়ন্ত্রিত হয় সেই একই নিয়মে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডও নিয়ন্ত্রিত হয়। কাজেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুপরমাণুরাই নিয়ন্ত্রণের মূল কেন্দ্রবিন্দু এবং এই ভাবে বিশ্ব নিজেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে। নিয়ন্ত্রণের কারণ এই বিশ্বের মধ্যেই ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে, তাই বিশ্বের বাইরে অবস্থানরত কোন নিয়ন্ত্রক গডের প্রয়োজন নেই। তাই ভারতীয় মতে নিয়ন্ত্রণের গতি ভিতর থেকে বাইরের দিকে, ক্ষুদ্র থেকে বৃহতের দিকে, বাইরে থেকে ভিতর দিকে

(১৫৫ ক) এই মডেল অনুসারে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা মনে করে মস্তিস্ক সমস্ত দেহ যন্ত্রকে চালাচ্ছে। কিন্তু ভারতীয় মতে সমস্ত দেহই চৈতন্যময়। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ বা প্রতিটি কোষই চৈতন্যময়। বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান এই ভারতীয় মতকেই সমর্থন করছে। দেখা যাচ্ছে যে মস্তিস্ক মরে গেলেও দেহ কোষ জীবিত থাকে। রক্তের শ্বেত কণিকা যখন জীবাণু ধরে খায় তখন তার ব্যবহার ঠিক এককোষী প্রাণী এমিবার মত। কাজেই দেহের প্র   কোষই পূর্ণ চৈতন্যময় এককোষী প্রাণী।

নয়, বৃহৎ থেকে ক্ষুদ্রের দিকে নয়। মানুষ নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করবে। সেই নিয়ন্ত্রিত মানুষ পরিবারকে নিয়ন্ত্রণ করবে। নিয়ন্ত্রিত পরিবার সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করবে এবং নিয়ন্ত্রিত সমাজ রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রিত করবে। "আত্মনস্ত কামায়'সর্বং প্রিয়ং ভবতি"— অন্তরস্থিত আত্মার জন্যই সবকিছু প্রিয় হয়। কাজেই সমাজ বা রাষ্ট্রের মূল কারণ মানুষ যদি প্রিয় না হয়, মধুর না হয় তাহলে সমাজও মধুর হতে পারে না, রাষ্ট্রও মধুর হতে পারে না। মানুষ মধুর হবে কি করে? মানুষ মধুর হবে ধর্মকে আশ্রয় করে, অন্তরস্থিত দেবত্বকে অনুভব করে। তাই মানুষকে পশু বলে চিহ্নিত করলে, পাপী বলে চিহ্নিত করলে সমাজ, সংসার, রাষ্ট্র সবই পশুত্বে পর্যবসিত হতে বাধ্য, পাপে নিমগ্ন হতে বাধ্য। কাজেই ইয়োরোপকে আজ সর্বপ্রথম এই ঘোষণা করতে হবে যে, মানুষ তুমি পশুও নও, পাপীও নও, তুমি অমৃতের পুত্র এবং এই ঘোষণার পরিপন্থী যা কিছু তত্ত্ব আছে সে সব কিছুকে নিমেষে পরিত্যাগ করতে হবে। তবেই ইয়োরোপ মধুময় সমাজ ও মধুময় রাষ্ট্রগঠনের পথ খুঁজে পাবে।

পুরাকালে ভারতে রাজাও ছিল না, রাজ্যও ছিল না। ধর্মাশ্রিত মানুষ নিজেরাই নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতো। তখন মানুষ মধুময় ছিল তাই সমাজও মধুময় ছিল। পরবর্তীকালে রাজা এবং রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছে বটে কিন্তু একজন ব্যক্তিবিশেষের উপর সেই রাজশক্তির নিয়ন্ত্রণ ছিল নামমাত্র। গ্রামসভা, পঞ্চায়েত, ইত্যাদির মাধ্যমে প্রজারা নিজেরাই নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করত। রাজশক্তিও এইসব সভা-সমিতির কাজে কোন ব্যাঘাত ঘটাত না। কোন গ্রাম বা কোন জনপদ মগধরাজের অধীনে আছে কি কাশীরাজের অধীনে আছে তাতে ব্যক্তি জীবনের বা সমাজ জীবনের কোন হেরফের হত না। উপরিউক্ত সভা সমিতিগুলি এত ক্ষমতাশালী ছিল যে অনেক সময় তারা কোন অত্যাচারী বা অযোগ্য রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে কোন যোগ্য ব্যক্তিকে সেই পদে অধিষ্ঠিত করত। এইভাবেই নিয়ন্ত্রিত মানুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সমাজ ও নিয়ন্ত্রিত সমাজ দ্বারা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হত। সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে আজকের রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ভোটের গণতন্ত্রের থেকে তা গণতন্ত্রের প্রকৃত আদর্শের অনেক বেশী নিকটবর্তী ছিল। এই আদর্শকে অনুসরণ করেই আজ গ্রামপঞ্চায়েৎগুলোকে শক্তিশালী করার ও লোক আদালত গঠন করার প্রতি জোর দেওয়া হচ্ছে কারণ এই ধারণা ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে যে বিকেন্দ্রীকরণের মধ্য দিয়েই প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, পাশ্চাত্যের মত রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে নয়।

কিন্তু পশ্চিম থেকে যে রাজনৈতিক দলবাজীর বিষ–বাষ্প আমরা নিয়ে এসেছি তার ফলে এই শুভ প্রচেষ্টা কতদূর সার্থক হবে বলা শক্ত।

ভারতের উপরিউক্ত শাসন ব্যবস্থার আর একটা শুভফল হয়েছিল এই যে রাজশক্তি কোনদিনও এ দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ পায়নি। তাই ভারতীয় সংস্কৃতি কোনদিনই রাজশক্তিনির্ভর হয়নি। এই কারণে ভারতে রাজশক্তির অদল বদল শাশ্বত হিন্দু সংস্কৃতির উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। এর ফলেই বিগত ৭০০ বছরের মুসলমান শাসন এবং পরবর্তী ২০০ বছরের খ্রীস্টান শাসন ভারতের সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করতে পারেনি। রাজশক্তি নিয়ন্ত্রিত সংস্কৃতি একটা গাছের মত, গোড়াটা কেটে ফেললে পুরো গাছটাই বিনষ্ট হয়। কিন্তু ব্যক্তি ও সমাজ নিয়ন্ত্রিত হিন্দু সংস্কৃতি ঘাসের মত। তাকে নিশ্চিহ্ন করতে হলে একটা একটা করে সমস্ত ঘাসকে উপড়ে ফেলতে হবে। এ বড় কঠিন কাজ। এই কারণে ব্যাবিলনের রাজশক্তি বিনষ্ট হলে তার সংস্কৃতিও বিনষ্ট হয়, মিশর বা গ্রীসের রাজশক্তি বিনষ্ট হলে তাদের সংস্কৃতিও বিনষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু হিন্দু সংস্কৃতি অটুট থাকে।

ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে পাশ্চাত্যের প্রায় সব পণ্ডিতরাই দুটো অভিযোগ করে থাকেন। প্রথমত এই সব পড়তে গিয়ে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না কারণ ভারতের সব শাস্ত্রই কুহেলিকাপূর্ণ বা mystic. দ্বিতীয়ত ভারতীয়রা দর্শনের সঙ্গে ধর্ম এবং ধর্মের সঙ্গে দর্শন মেশামিশি করে ফেলেছে। ভারতীয় দর্শন ও ধর্মমতে উপলব্ধি বা realisation-ই হল জ্ঞানের চূড়ান্ত পর্যায়। "Religion is not the acceptance of academic abstractions or celebration of ceremonies, but a kind of life and experience. It is insight into the nature of reality (darsana), or experience of reality (anubhaba)."[১৩৬]। যাহাতে দ্যুলোক ভূলোক, অন্তরীক্ষ ও ইন্দ্রিয় বর্গসহ অন্তঃকরণ সমর্পিত আছে" (মুণ্ডকঃ ২/১/৫) তিনি "ন চক্ষুষা গৃহ্যতে"—চক্ষুদ্বারা দৃশ্য হন না। নির্মল বুদ্ধি ও ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিগণ সেই নিরাবয়ব ব্রহ্মকে অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা দর্শন করেন। "It is the vision of soul, that power by which spiritual things

(১৩৬) The Hindu View of Life, S. Radhakrishnan, p. 13.

are apprehended, just as material things are apprehended by physical senses."(১৫৭)

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব সংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।।
(মুণ্ডকঃ ২/২/৮)।

সেই পরমাত্মা দৃষ্ট হলে উক্ত সাক্ষাৎকারীর হৃদয়গ্রন্থি বিনষ্ট হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয় এবং কর্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ভারতীয় ধর্ম মতে সেই সাক্ষাৎকারই মনুষ্য জন্মের চরম লক্ষ্য, শুধু নীরস শাস্ত্রের আলোচনা নয়। "বিবেকান্নিঃশেষদুঃখনিবৃত্তৌ কৃতকৃত্যতা নেতরগ্নেতরৎ (সাঙ্খ্যঃ ৩/৮৪)। সেই বিবেক সাক্ষাৎকার হলেই সকল দুঃখের নিবৃত্তি হয়। বস্তুতপক্ষে সেই বিদেহ কৈবল্যই পরম মোক্ষ। তাই ভারতীয় ধর্ম দর্শন শুধু জ্ঞানের আলোচনার মধ্যই সীমাবদ্ধ নয়, পরম পুরুষকে সাক্ষাৎ করার বাস্তব পথও বটে। কতক বৃক্ষের ফল জলে দেবো এই চিন্তা করলেই যেমন জল পরিষ্কার হয় না, সেই ফল গাছ থেকে পেড়ে জলে ফেলতে হয় (মনুঃ ৬/৬৭), সেই রকম শুধু যুক্তি বিচার বা শাস্ত্র আলোচনার দ্বারাই সেই পরম পুরুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। ধ্যান-ধারণা, জপ প্রাণায়াম ইত্যাদির মাধ্যমে বুদ্ধি নির্মল হলে, চিত্ত কামনাশূন্য হলেই হৃদয়গুহায় অবস্থিত সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর, স্থূল থেকে স্থূলতর সেই পরমাত্মা হৃদয়ে উদ্ভাসিত হন।

"পাশ্চাত্য জাতি জড় বিজ্ঞানের চর্চায় যতই উন্নত হোক না কেন, দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তারা শিশুমাত্র। জড়বিজ্ঞান শুধু ঐহিক উন্নতি বিধান করিতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্ম বিজ্ঞান থেকে আসে অনন্ত জীবন। ... জড়বাদপ্রসূত নির্বুদ্ধিতা থেকে আসে প্রতিযোগিতা, অযথা উচ্চাকাঙ্ক্ষ এবং পরিণামে ব্যষ্টি ও সমষ্টির মৃত্যু"(১৫৮)। "পাশ্চাত্যে ধর্মপুস্তকসমূহ inspired—সুতরাং শ্বাস গ্রহণের মত বাহির হইতে ভিতরে আসিয়াছে। আমাদের ধর্মপুস্তকসমূহ expired—শ্বাস পরিত্যাগের ন্যায় ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়াছে। ঐগুলি ঈশ্বর নিঃশ্বসিত। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের হৃদয় হইতে উহারা নিঃসৃত হইয়াছে।"(১৫৯) "একমাত্র প্রশ্ন, প্রত্যক্ষ হইয়াছে কি? ইহাই বেদান্তের মূল কথা—ধর্ম সাক্ষাৎকার! শুধু কথায় কিছু হইবে না"।(১৬০)

(১৫৭) ibid, p. 14. (১৫৮) বিবেকানন্দ রচনাবলী, - (৭/৩৩২)।
(১৫৯) - ঐ- , (৫/২৭৭)। (১৬০) -ঐ- , (২/১৯১)।

জড়বাদী পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে যা কিছু দেখার তা চোখ দিয়েই দেখা সম্ভব এবং অন্তর্দৃষ্টি বলে কিছু থাকা সম্ভব নয়। উপহাসচ্ছলে তারা বলেন যে, চোখ খুলে যা দেখা যায়, চোখ বুজে কি তার থেকে বেশী কিছু দেখা যায় নাকি!(১৬১) এব্যাপারে আমাদের ঋষিদের বক্তব্য হল, "নান্ধাঽদৃষ্টা চক্ষুষ্মতামনুপলম্ভঃ" অর্থাৎ অন্ধ দেখতে পায় না বলে কি চক্ষুষ্মানও দেখতে পাবে না (সাঙ্খ্যঃ ১/১৫৬)। কিন্তু সকলের পক্ষে এই প্রত্যক্ষ অনুভূতি সম্ভব নয় কারণ গুটিপোকা যেমন নিজের চারিদিকে আচ্ছাদন তৈরি করে, মানুষও তেমনি অবিবেক দ্বারা আচ্ছাদন তৈরি করে বিবেকের পথ বন্ধ করে রেখেছে। বিবেক না জন্মালে সাক্ষাৎকার হয় না, তাই মুক্তিও অসম্ভব (সাঙ্খ্যঃ ৩/৭৩,৭৪)। "ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্, হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তঃ"—চক্ষুর দ্বারা তিনি দৃশ্যমান হন না, হৃদয়ে অবস্থিত বিষয় কল্পনাশূন্য বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা উপলব্ধ হন"(কঠঃ ২/৩/৯)। "সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যজ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেন নিত্যম্" (মুণ্ডকঃ ৩/১/৫)। তাই তপশ্চর্যার দ্বারা মনকে কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে নিতে হবে। "তত্ত্বভ্যাসান্নেতি নেতীতি ত্যাগবদ্ বিবেকসিদ্ধিঃ (সাঙ্খ্যঃ ৩/৭৫)। তাই অর্জুন যখন বললেন, "হে কৃষ্ণ, এই দুষ্কর কাজ আমি কেমন করে করব?" ভগবান বললেন, "অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে" (গীঃ ৬/৩৫)। "ধ্যানং নির্বিষয়ং মনঃ"(সাঙ্খ্যঃ ৬/২৫)। মরুভূমিতে যেমন অঙ্কুর জন্মে না, মলিন দর্পণে যেমন প্রতিবিম্ব হয় না, পঙ্কের দোষে যেমন পঙ্কজের গুণ নষ্ট হয়, তেমনি কামনা-তাড়িত চঞ্চল চিত্তেও তিনি উদ্ভাসিত হন না (সাঙ্খ্যঃ ৪/২৯,৩০,৩১)। সোনার গহনা ধুয়ে ময়লা পরিষ্কার করলেই তা চকচক করে (শ্বেতাঃ ২/১৪)। তাই পরমাত্মার সাক্ষাৎ পেতে গেলে সাপের খোলস ত্যাগ করার মতই অক্লেশে কামনা ত্যাগ করতে হবে। পিঙ্গলার মত শারীরিক সুখের আশা ত্যাগ করতে হবে, ইষুকার মত একাগ্র হতে হবে (সাঙ্খ্যঃ ৪/৬,১১,১৪) এবং রাধার মতই ব্যকুল হতে হবে। হংস যেমন জলের মধ্য থেকে দুধ আলাদা করে গ্রহণ করে তেমনি জাগতিক সংসার থেকে শুধু আত্মাকে গ্রহণ করতে হবে (সাঙ্খ্যঃ ৪/২৩)।

কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে উপরিউক্ত সমস্ত কথাবার্তা, চিন্তাভাবনা সবই mysticism বা কুহেলিকা এবং সেই কারণে পরিত্যজ্য। জ্ঞান বলতে তারা বোঝে জড়জ্ঞান। আত্মজ্ঞান, মোক্ষ, সমাধি, কৈবল্য, নির্বাণ ইত্যাদি শব্দগুলি তাদের

(১৬১) Hist., of West. Phil., pp.

কাছে অর্থহীন। তাদের ডিক্শনারীতেও এই সব শব্দের কোন প্রতিশব্দ নেই। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন। ঐ সব পণ্ডিতরা অনেক ক্ষেত্রে আত্মার ইংরাজী spirit করেন। এই অনুবাদ কতখানি গ্রহণযোগ্য তা সুধী পাঠকদের বিবেচনাধীন। যাই হোক, এই কারণে হেগেল যখন বলেন যে, absolute pure Being-এর কোন গুণ নেই, জড়বাদী পাশ্চাত্যপণ্ডিতদের তা বুঝতে অসুবিধা হয়। যেহেতু গুণ ছাড়া কোন জড়বস্তু থাকতে পারে না, তাই তাঁরা হাহা করে ওঠেন, বলেন, তা হলে Absolute Beingও থাকতে পারে না। অথবা তিনি যখন মত প্রকাশ করেন যে, Absolute Being is the whole composed of uncle and nephew, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কাছে তা দুর্বোধ্য মনে হয় এবং তাঁরা তাঁকে mystic বলে গালমন্দ করেন। কিন্তু একজন হিন্দুর পক্ষে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তিনি প্রকারান্তরে "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদম্"-ই বোঝাতে চাইছেন। উপরন্তু Hegel যখন বলেন, "This unity is consequently the absolute truth, the idea which thinks itself," তখন একজন হিন্দুর পক্ষে বৃহদারণ্যক উপনিষদের সেই অংশটুকু মনে না এসে পারে না সেখানে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলেছেন যে, যতক্ষণ দ্বৈত ভাব থাকে ততক্ষণই একে অন্যকে দেখে, একে অন্যকে স্পর্শ করে, একে অন্যকে আঘ্রাণ করে, একে অন্যকে শ্রবণ করে। কিন্তু সবই যখন এক হয়ে গেল তখনই কিসের দ্বারা কি স্পর্শ করবে, কিসের দ্বারা কি আঘ্রাণ করবে, কিসের দ্বারা কি শুনবে, কিসের দ্বারা কি চিন্তা করবে, কিসের দ্বারা কি জানবে (২/৪/১৪)? যার সাহায্যে লোকে এই সকলকে জানে তাকে কিসের দ্বারা জানবে? হে প্রিয়ে, সেই বিজ্ঞতাকে কিসের দ্বারা জানবে? "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা"—তিনি যাকে কৃপা করেন একমাত্র সেই তাঁকে জানতে পারে।

সেই রকম Spinoza যখন বলেন যে, Everything that happens is a manifestation of God's inscrutable nature, পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা লাফিয়ে উঠে বলেন যে, এ হতে পারে না। কারণ তাহলে খ্রীস্টধর্মের পাপের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা মুশকিল হয়ে পড়ে। কিন্তু একজন হিন্দুর মনে গীতার সেই শ্লোকটি (১৮/৬১) না এসে পারে না যেখানে শ্রীভগবান বলেছেন, "হে অর্জুন, ঈশ্বর সর্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মায়া দ্বারা পুত্তলিকার ন্যায় সকলকে ভ্রমণ করাইতেছেন।" এ প্রসঙ্গে গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের কথা কিছুটা আলোচনা করা চলতে পারে। তিনি

সামান্য পোশাক পরে গ্রীসের প্রচণ্ড শীতে নগ্ন পদে বরফের উপর চলাফেরা করতেন। যে রকম সহজে তিনি নিজহাতে হেমলক বিষ পান করেছিলেন তা থেকে বোঝা যায় যে তাঁর মৃত্যুভয় ছিল না। কাজেই তিনি শীতোষ্ণ, সুখদুঃখ ও মানাপমানের অতীত এবং আত্মদর্শী ছিলেন কারণ শ্রীভগবান গীতায় বলেছন, "জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মাসমাহিতঃ। শীতোষ্ণ সুখদুঃখেসু তথা মানাপমানয়ঃ।। (৬/৭)। সক্রেটিস প্রায়ই সমাধিস্থ হতেন। একবার এথেন্সের পথে চলতে চলতে সমাহিত হয়ে পড়েন এবং পুরো একদিন একরাত্রি প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে ঐ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকেন। মজা দেখতে সমস্ত এথেন্সের লোক এসে সেখানে জমা হয়। পরদিন সকালে সমাধি ভগ্ন হলে তিনি আবার চলতে শুরু করেন। কিন্তু অচৈতন্য জড়বাদী পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা তাঁর এই সমাধিস্থ হওয়াকে excessive preoccupasion বা মানসিক রোগের লক্ষণ বলে উপহাস করেন। উপরন্তু সক্রেটিস যখন বলেন যে, অজ্ঞানের জন্যই মানুষ পাপ করে, প্রকৃত ন্যায়পরায়ণ হতে গেলে জ্ঞানের প্রয়োজন তখন মনে হয় তিনি "জ্ঞানান্মুক্তি", এই কথাই বোঝাতে চাইছেন। এ প্রসঙ্গে প্ল্যাটোর একটা কথা স্মরণ করাও যুক্তিযুক্ত হবে। তিনি বলতেন যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ ও বুদ্ধিগ্রাহ্য জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ দেখতে যেমন চক্ষু ইন্দ্রিয় ও আলোর দরকার বুদ্ধিগ্রাহ্য জগৎ দেখতে তেমনি সত্য ও আত্মার পবিত্রতা দরকার। অর্থাৎ সেই, "ন চক্ষুষা গৃহ্যতে"।

কাজেই এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, আমাদের ঋষিরা যা বলে গেছেন তা প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার ও উপলব্ধিগত বলে শাশ্বত সত্য। হাজার হাজার বছর আগেও তা সত্য ছিল। আজও সত্য আছে এবং হাজার হাজার বছর পরেও তা সত্য থাকবে। "যৎ তৎ পশ্যসি তদ্‌বদ" অর্থাৎ আপনি যা দেখেছেন তাই বলুন, এই হল উপনিষদের সার, কাজেই তা পুরাণো হবার নয়। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য জড়বাদী পণ্ডিতরা শুধু চক্ষু ইন্দ্রিয়র দ্বারা ভৌতিক দেখা বোঝেন। তাই অন্তর্দৃষ্টি তাদের কাছে অবিশ্বাস্য ও mystic ব্যাপার। সব থেকে বড় কথা হল তারা যেমন তর্কের টেবিলে তাদের দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করে ঘরে ফিরে আহার ও মৈথুনের পর সুখনিদ্রা দিতে পারেন আমাদের দর্শনও কেন সেই রকম শুধু নীরস তত্ত্বের আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল না ? কেন তাতে ত্যাগ বৈরাগ্যের কথা বলা হল, কেন তাতে ধ্যান ও তপস্যার কথা বলা হল, কেন তাতে মুক্তির জন্য যত্ন করার কথা বলা হল ? পাশ্চত্য পণ্ডিতদের এই সমস্ত

কথাবার্তা শুনলে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের সেই শ্লোকটির কথা মনে পড়ে যেখানে আমাদের ঋষি বলছেন,

বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্।
নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ।। (৬/২২)

উপনিষৎসমূহে পরমপুরুষার্থরূপ অতিগুহ্যতত্ত্ব পূর্বকল্পে উপদিষ্ট হইয়াছিল। যে শান্ত নহে এবং পুত্র বা শিষ্য নহে তাহাকে উহা প্রদান করা উচিত নয়। কারণ,

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ
প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।। (ঐ ৬/২৩)

অর্থাৎ পরমেশ্বরের প্রতি যার পরাভক্তি আছে এবং গুরুর প্রতিও অনুরূপ ভক্তি আছে সেই মহাত্মার নিকটেই এই সকল বিষয় অনুভবযোগ্য হয়। আজ থেকে বহুকাল আগে স্বয়ং ভগবান হয়তো এই সমস্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের উদ্দেশ্য করেই বলে গেছেন,

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্।। (৭/২৫)[১৬২]

দ্বিতীয় অভিযোগটি আরও হাস্যকর। যেন আমাদের ঋষিরা তাদের ধর্মমতকে দার্শনিক তত্ত্ব ও যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করে খুবই অন্যায় করে ফেলেছেন। তাদের ধর্মের মত আমাদের ধর্মও কেন যান্ত্রিক বিশ্বাস ও যান্ত্রিক উপাসনার সমষ্টি হল না। কিছু অন্ধ বিশ্বাস ও নিয়ম-কানুনের সমষ্টি হল না। অর্ধ বর্বর সেমিটিক পশুপালকদের শিশুসুলভ গল্প কেন আমাদের ধর্মের ভিত্তি হল না। ভারতীয় ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে হেয় প্রতিপন্ন করতে ইয়োরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে বৃটিশ জাতি সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য। কারণ যে দেশকে তারা ২০০ বছর শাসন করে গেল, যে দেশের লোকেদের তারা black native ও বর্বর বলতে অভ্যস্ত, তারা তাদের নিজস্ব সভ্যতা থেকে উন্নত কোন সভ্যতা ও সংস্কৃতির মালিক হতে পারে তা স্বীকার করতে তাদের অহমিকায় বাঁধে। কিন্তু আজকের এই সুসভ্য ইংরাজ জাতি জুলিয়াস সীজারের আমলেও চামড়া দিয়ে কোন মতে লজ্জা নিবারণ করে বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াত, মানুষ ও পশুর মধ্যে

(১৬২) বঙ্গানুবাদ ২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কি প্রভেদ তা বোঝার মত জ্ঞান ছিল না এবং তাদের দেবদেবীকে খুশি করার জন্য মানুষকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারত। তাদের যা কিছু গর্বের বস্তু তার বয়স ৯০০ বছরের বেশী নয় কারণ নবম শতাব্দীতে ডেনদের দ্বারা আয়ারল্যাণ্ড দখলের মধ্য দিয়েই ইংল্যাণ্ডে বর্বর যুগের অবসান হয়। কাজেই এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে তাদের পূর্বপুরুষরা যদি গীতা বা উপনিষদের মত একটি গ্রন্থ বা রামায়ণ-মহাভারতের মত একটি কাব্য লিখে রেখে যেত তবে তাদের আস্ফালনে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ হয়ে যেত। পক্ষান্তরে আমাদের অবস্থা হয়েছে বিদ্বান পিতার মূর্খ পুত্রের মত। উত্তরাধিকার সূত্রে পূর্বপুরুষের কাছ থেকে যে অমূল্য সম্পদ আমরা পেয়েছি তার অর্থ বোঝার মত বুদ্ধি আমাদের নেই। সর্বাপেক্ষা বৈজ্ঞানিক ও প্রাচীন বলে যে সংস্কৃত ভাষা অন্য যে কোন জাতির গর্বের বস্তু হত, উত্তরাধিকার সূত্রে তা পেয়েও আমরা তার মর্যাদা বুঝতে পারি না—তাকে গলা টিপে হত্যা করার চেষ্টা করছি।

পাশ্চাত্য থেকে কিছুই গ্রহণ করার নেই ঃ

আমাদের দেশে অনেক বিজ্ঞানমনস্ক পণ্ডিত; বিশেষ করে তথাকথিত প্রগতিশীল পণ্ডিতরা অনেক মেহনৎ করে এটা আবিষ্কার করতে পেরেছেন যে পাশ্চাত্যে আর যাই কিছু থাক না কেন, কুসংস্কার নেই। কিন্তু তারা অনেক কম মেহনৎ করে এই ধ্রুব সত্য আবিষ্কার করতে পারতেন যে, পাশ্চাত্য সমাজে যে টুকু কুসংস্কার আছে পশুদের সমাজে তাও নেই। কারণ সংস্কার থাকলেই তাকে কখনও সু বা কখনও কু আখ্যা দেওয়া চলে। তাই যাদের কোন সংস্কার নেই তাদের কু বা সু, কোন সংস্কারই থাকতে পারে না। অনেকে আবার খেলাধুলায় পাশ্চাত্য সমাজের বর্তমান উন্নতিকে অনেক শ্রদ্ধার চোখে দেখতে অভ্যস্ত, ভাবেন এরা কত জোরে ছুটতে পারে, কত দূরে লাফাতে পারে। কিন্তু আরও জোরে ছুটতে পারে বলে কি ঘোড়াকে শ্রদ্ধা করতে হবে? আরও বেশী লাফাতে পারে বলে কি ক্যাঙারুকে সম্মান করতে হবে? আরও বেশী বোঝা বইতে পারে বলে কি গাধার গুণগান করতে হবে?

অনেকে আবার এই মত পোষণ করেন যে, পাশ্চাত্য থেকেও আমাদের কিছু কিছু গ্রহণ করার আছে যেমন তাদের জড়বিজ্ঞান এবং তাদের কর্মোদ্যম। যাঁরা বর্তমান বিজ্ঞানের উন্নতিতে চমৎকৃত হয়ে পশ্চিমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়েন, বিনীত ভাবে তাদের এই অনুরোধ করা চলতে পারে যে, তাঁরা প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান চর্চা ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ইতিহাস একবার একটু পড়ে দেখুন। তাহলে অন্তত এটুকু বুঝতে পারবেন যে, বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে আমাদের পূর্বপুরুষরা কত সূক্ষ্ম মেধার অধিকারী ছিলেন। আজও এই কথা সমান ভাবে প্রযোজ্য। এর প্রমাণ হিসাবে বলা যায়, বর্তমানে বহু ভারতীয় বিজ্ঞানী পশ্চিমের গবেষণাগারগুলিতে যে উচ্চ মেধার পরিচয় দিয়ে চলেছেন তা বিস্ময়কর। কাজেই জড়বিজ্ঞানে ভারতের বর্তমান অনগ্রসরতার কারণ মেধার নিকৃষ্টতা নয়। ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, বিজ্ঞানচর্চার যে সুউন্নত ধারা অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতে চলে আসছিল, মুসলমান আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে তার দ্রুত পতন হয়। এ থেকে প্রমাণ হয় যে ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চার অবনতির কারণ মেধার অধঃপতন নয়, কারণ এত অল্প সময়ের মধ্যে একটা জাতির মেধার এতটা অধঃপতন বা অবক্ষয় সম্ভব নয়। অনাদি কাল থেকে ভারতে যে সংস্কৃতির ধারা চলে আসছিল

তার উপর বিদেশী শাসকদের নিয়ন্ত্রণই এর কারণ। যে শিক্ষাব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থা এককালে আর্যভট্টের মত বিজ্ঞানী, বরাহমিহির বা শ্রীধর আচার্যের মত গণিতজ্ঞ বা চরক বা সুশ্রুতের মত চিকিৎসাবিদের জন্ম দিয়েছিল, বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণের দ্বারা সেই শিক্ষা ও সমাজব্যবস্থার অধঃপতনই তার কারণ। কাজেই বিজ্ঞানে ভারতের বর্তমান অনগ্রসরতার কারণ ও বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ, মেধার অভাব নয়। ভবিষ্যতে যে দিন ভারত নিজেকে এই বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করতে পারবে সেদিন সে যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করবে এ ব্যাপারে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।[১৬৩]

গীতায় কর্মের যে মহান আদর্শের কথা রয়েছে সে সম্পর্কে ভারতের প্রথম বড়লাট লর্ড কর্নোয়ালিসের মন্তব্য হল, গীতার আদর্শ অনুসরণ করে যে কোন জাতি গরিমার সর্বোচ্চ শিখরে অনায়াসে পৌছে যেতে পারে। কাজেই বিদেশ থেকে কর্মের আদর্শ ধার করে আনার যারা পক্ষপাতী তাদের সম্পর্কে দৃঢ়তার সঙ্গে এ কথা বলা চলে যে, নিজের দেশে কর্মের কি আদর্শ আছে সে সম্পর্কে তারা সম্যক অবহিত নন। কাজেই আমাদের আশু প্রয়োজন হল বিদেশ থেকে কর্মের আদর্শ আমদানী করা নয়, বরং নিজেদের যে কর্মের আদর্শকে আমরা ভুলে বসে আছি তাকে পুনরায় জাগ্রত করা এবং সেই আদর্শের দ্বারা জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করা। আমরা আজ গীতার আদর্শ বিস্মৃত হয়ে কেন একটা শৌর্যবীর্যহীন ক্লীব জাতিতে পরিণত হয়েছি তার কতগুলি কারণ আছে। মধ্যযুগের ভারতীয় মহাত্মারা গীতার কর্মবাদের দ্বারা এদেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ তো করেনই নি, বরং বিপরীত কথা বলেছেন। গীতায় শ্রীভগবান কোথাও কর্মত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণের পরামর্শ দেন নি। এবং তিনি বলেছেন, ভাল মন্দ যাই হোক না কেন, প্রতিনিয়ত কর্ম করে যাও কারণ কর্ম না করে বসে থাকার চেয়ে কর্ম করা ভাল। উপরন্তু তিনি এও সাবধান করে দিয়ে গেছেন যে, যে সব অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি তাৎক্ষণিক সুখ-স্বাচ্ছন্দের আশায় কর্মে ব্যাপৃত রয়েছে, জ্ঞানী ব্যক্তিরা শাস্ত্র কথা বলে অনর্থক তাদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবেন না।

---

(১৬৩) বর্তমান স্বল্প পরিসরে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়। কারণ এটা নিজেই একটা পৃথক এবং বিশাল বিষয়।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গি নাম্।
জোষয়েৎ সর্বকর্মানি বিদ্বান্ যুক্ত সমাচরন্।। (৩/২৬)

কিন্তু মধ্য যুগের মনীষীরা গীতোক্ত সেই কর্মের আদর্শকে লঘু করে দেখলেন এবং বললেন যে, নিষ্কাম কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হতে পারে কিন্তু মুক্তি সম্ভব নয়। চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম ন তু বস্তূপলব্ধয়ে (বিঃ চূঃ ১১)। বরং সন্ন্যাস গ্রহণকেই মুক্তির উপায় বলে নির্দেশ করলেন। কাজেই দেশ জুড়ে কর্মত্যাগের হিড়িক পরে গেল এবং দলে দলে অনধিকারী সন্ন্যাসী হতে শুরু করল। দেশ থেকে কর্মের আদর্শ লুপ্ত হল, ক্ষাত্রতেজ, ক্ষাত্রবীর্য অন্তর্হিত হল। এক কালে ভারতে চতুরাশ্রম এবং বিশেষ করে গার্হস্থ্য আশ্রম অবশ্য পালনীয় ছিল। ভগবান মনু বলেছেন, চার আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্য আশ্রমই শ্রেষ্ঠ, কারণ তা বাকী তিন আশ্রমকে ধারণ করে। এককালে বেদ উপনিষদের ঋষিরাও সংসারী ছিলেন এবং অনেকেরই একাধিক পত্নী ছিল। নারী সংসর্গ বর্জন না করে শাস্ত্রানুযায়ী বিধিবদ্ধ স্ত্রী সংসর্গও ব্রহ্মচর্য বলে গণ্য হত। গার্হস্থ্য আশ্রম শেষ হলে বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস গ্রহণের বিধি ছিল। আশ্রম বহির্ভূত অবস্থায় কারও পক্ষে একদিন অতিবাহিত করাও সম্ভব ছিল না। ব্রহ্মচর্য আশ্রমের মধ্য দিয়ে ছাত্রজীবন সমাপ্ত হলে সমাবর্তন স্নানের পরদিনই দারপরিগ্রহ করে গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করার রীতি ছিল। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গার্হস্থ্য আশ্রম পালন না করে সন্ন্যাস গ্রহণ করা কৌটিল্যের মতে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হত।

সবচেয়ে বড় কথা হল, অতীতে ভারত যে ঐশ্বর্য ও সম্পদে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল তার জন্য তখন বিদেশ থেকে কর্মের আদর্শ ধার করে আনার প্রয়োজন হয়নি। এ ব্যাপারে আর একটা কথা হল, পাশ্চাত্যের কোন কিছুই বিশুদ্ধভাবে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। কিছু আনতে গেলেই বাড়তি হিসাবে তার সঙ্গে তাদের পশুভাবাপন্ন সংস্কৃতি চলে আসবে এবং ভারতীয় সমাজকে দূষিত করবে। এই দিক থেকে বিচার করতে গেলে পাশ্চাত্যের সমস্ত কিছুই বিষবৎ পরিত্যজ্য। পাশ্চাত্যের কর্মের উৎস হল survival of the fittest এবং এই কর্ম হল বাঘে হরিণ তাড়া করার মত। বাঘ ছুটছে হরিণকে ধরার জন্য আর হরিণ ছুটছে প্রাণ বাঁচাবার জন্য এবং এই ছোটাছুটিকেই আমরা কর্মের মহান আদর্শ বলে বাহবা বাহবা করছি। প্রকৃতপক্ষে তাদের এই কর্মের মধ্যে মহৎ আদর্শ বা উদ্দেশ্যের লেশমাত্র নেই। কিন্তু ভারতীয় কর্মের আদর্শ মোক্ষলাভ করার জন্য, তাৎক্ষণিক ইন্দ্রিয় সুখের জন্য

নয়। পাশ্চাত্যের পক্ষে ভারতীয় এই কর্মের আদর্শকে অনুধাবন করাই সম্ভব নয়। কর্ম বলতে পাশ্চাত্য বোঝে আপন স্বার্থসিদ্ধি ও বৈষয়িক উন্নতির জন্য শ্রম। তাই কর্ম কি? এই প্রশ্নের জবাবে ভারতবর্ষ যখন বলে, "ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ", তখন তার অর্থ বোঝাই পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই ভারতীয় ও পাশ্চাত্য কর্মের আদর্শ সম্পূর্ণ বিপরীত। পাশ্চাত্য কর্মের উদ্দেশ্য পরপীড়ন ও লুণ্ঠন—সকলকে নাশ করে আমরা বেঁচে থাকবো। ভারতীয় কর্মের লক্ষ্য সকলকে নিয়ে আমরা বাঁচবো।

কাজেই বলা চলে যে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য ভাবধারার মধ্যে যে পার্থক্যগুলি রয়েছে তার প্রধান উৎস হল এই যে, পাশ্চাত্য মানুষের মধ্যে দেবত্ব স্বীকার করে না। তাদের মতে মানুষ মূলত পশু। তত্ত্বমসির মতো কোন উচ্চ মানবিক আদর্শ তাদের সামনে নেই বলে মানুষের দ্বারা মানুষের পীড়ন, শোষণ, হত্যা ও লুণ্ঠন তাদের মধ্যে স্বাভাবিক ও মজ্জাগত। উপরন্তু তাদের অনুসৃত সেমিটিক ধর্মমতও তাদের পশুত্বের স্তরেই আবদ্ধ করে রাখার চেষ্টা করছে কারণ এই ধর্মমত অনুযায়ী মানুষ মূলত পাপী ও শয়তানের দ্বারা চালিত। কাজেই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, যতদিন না তারা তত্ত্বমসি বাণীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে এবং মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত দেবত্বকে দেখতে পাবে ততদিন পশুত্বের স্তর থেকে উর্ধ্বে ওঠা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ততদিন তাদের দ্বারা সমগ্র মানবজাতির পক্ষে কল্যাণকর কোন তত্ত্ব উপস্থিত করাও সম্ভব নয়।

চৈতন্য ঃ পাশ্চাত্য ও ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী

খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। মাত্র বছর দশেক আগেও প্রকৃতির সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর সৃষ্টি মানুষের মস্তিষ্কের কার্যকলাপ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো ছিল এক অসম্ভব কাজ। মনুষ্যেতর প্রাণীর মস্তিষ্কে সূক্ষ্ম যন্ত্রাংশ ঢুকিয়ে যেটুকু জ্ঞান সংগ্রহ করা যেত তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। কিন্তু বর্তমান কারিগরী বিজ্ঞানের দুটো উদ্ভাবন, ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং (MRI) ও পসিট্রন এমিশান টোমোগ্রাফি (PET) মানব মস্তিষ্কের গবেষণার ব্যাপারে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেছে। এই দুই আবিষ্কারের ফলে মানব মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ বিজ্ঞানীদের পক্ষে সরাসরি কমপিউটারের পর্দায় দেখা সম্ভব হচ্ছে। বিজ্ঞানীদের পক্ষে দেখা সম্ভব হচ্ছে যে, কি করে চোখের পর্দা বা রেটিনা থেকে দেখার সংবেদ (impulse) আমাদের দর্শন স্নায়ুর (optic nurve) মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্কের সেরিব্রাল করটেক্স-এ পৌছাচ্ছে এবং দেখার অনুভূতি সৃষ্টি করছে।

মানব মস্তিষ্কের সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যময় কাজ হল, অসংখ্য ঘটনা, অসংখ্য জিনিস মনে রাখা এবং সময়মতো তাকে স্মরণে নিয়ে আসা। ভাবলে অবাক হতে হয় যে, আমরা কত লোকের চেহারা ও গলার স্বর মনে করে রাখি এবং সময় মতো সেই লোককে দেখলে বা তার গলার স্বর শুনলে তাকে চিনতে পারি। এরকম আরও কত কত জিনিস আমরা মনে করে রাখি যা গুনে শেষ করার উপায় নেই।

বিজ্ঞানীদের মতে, আমাদের মস্তিষ্ক দু ধরনের কোষ দিয়ে তৈরী। নিউরন (Neuron) কোষ ও গ্লায়াল (Glial) কোষ। একজন সাধারণ মানুষের মস্তিষ্কে প্রায় ১০,০০০ কোটি নিউরন কোষ এবং ১,০০,০০০ কোটি গ্লায়াল কোষ আছে। মনে রাখা বা কোন কিছু শেখা ইত্যাদি যাকে আমরা মগজের কাজ বলি, তার সবকিছুই করে নিউরন কোষগুলো। গ্লায়াল কোষগুলোর কাজ হল নিউরন কোষগুলোকে পুষ্টি যোগানো এবং এই গ্লায়াল কোষগুলোর মধ্যে নিউরন কোষগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। প্রত্যেকটা নিউরণ কোষের একটা শুঁড়ের মতো লম্বা অংশ থাকে, যাকে বলে অ্যাক্সন। এই অ্যাক্সনগুলোর ডগার দিকটা নানাভাবে ভাগ হয়ে অন্যান্য নিউরনের খুব কাছে গিয়ে শেষ হচ্ছে কিন্তু স্পর্শ করছে না।

আমরা যখন কিছু দেখি বা শুনি বা অন্য কোন ভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোকে উত্তেজিত করি তখন খুব ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুতের স্পন্দন তৈরী হয় এবং এর ফলে

অ্যাক্সন -এর ডগাগুলো অন্য নিউরনকে স্পর্শ করে এবং এইভাবে জুড়ে গিয়ে নানারকম নক্‌শার সৃষ্টি করে। এক সেকেন্ডের ১০০০ ভাগের ১ ভাগ সময়ের মধ্যে স্পন্দনগুলো শেষ হয়ে যায়। কিন্তু নক্‌শাটা থেকে যায়। কোন কিছু বার বার দেখলে বা শুনলে নক্‌শাগুলো আরো পাকাপাকি ভাবে বসে যায় এবং দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির সৃষ্টি করে।

আমেরিকার আইওয়া (Iowa) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নায়ু বিজ্ঞান-এর অধ্যাপক ডঃ অ্যান্টোনিও দামাসিও'র মতে, কোন কিছু শেখা, মনে রাখা ইত্যাদি সবকিছুই মস্তিষ্কের নিউরন কোষগুলিই এইভাবে নক্‌শা তৈরি করে থাকে। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিদ্যার অধ্যাপক ডঃ ল্যারি স্কোয়ার-এর মতেও, যে কোন ধরনের স্মৃতির অর্থই হল নিউরনগুলো দ্বারা তৈরি বিশেষ বিশেষ নক্‌শা। মস্তিষ্কে এরকম অসংখ্য নক্‌শা তৈরি হয়, কোনটা শোনার, কোনটা দেখার, কোনটা গন্ধের ইত্যাদি। উপরন্তু এই নক্‌শাগুলোর নিজেদের মধ্যে সংযোগ থাকার ফলে কোন ব্যাপার মনে এলে সেই সংক্রান্ত আরও অনেক স্মৃতি হু হু করে মনে এসে যায়। বর্তমান গবেষণার ফলে বিজ্ঞানীরা এটাও স্থির করতে পেরেছেন যে, মস্তিষ্কের কোন্ কোন্ অংশ কোন্ কোন্ কাজ করে বা কোন্ কোন্ সংবেদে সাড়া দেয়। যেমন সুষুম্নাকাণ্ড ও মস্তিষ্কের সংযোগস্থলে মটর দানার মতো ছোট্ট অ্যামিগডালা নামক অংশে ভয় বা ভয় সংক্রান্ত স্মৃতি জমা থাকে। ডান ও বাম মস্তিষ্কে ব্যাসাল গ্যাংলিয়া নামে যে অংশ দুটো রয়েছে তারা দৈনন্দিন হাত-পায়ের কাজ সহ শিল্পীর হাতে সূক্ষ্ম কাজকর্মও নিয়ন্ত্রণ করে। সেরিবেলাম নামে অংশটা আমাদের শিক্ষাদীক্ষা ও সাংস্কৃতিক দিকগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। তবে একটা আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই যে, মস্তিষ্কের ডান অংশ শরীরের বাম অংশের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে এবং বাম অংশ শরীরের ডান অংশের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। ১৩ বছর বয়সী ব্রাণ্ডী বাইশুার নামে আমেরিকার একটি মেয়ের ভীষণ ফিটের রোগ হয় এবং ডাক্তাররা কোন উপায়ান্তর না দেখে ব্রাণ্ডির মস্তিষ্কের ডান দিকের করটেক্স অংশটা কেটে বাদ দিয়ে দেয়। এর ফলে তার বাঁ হাত ও বাঁ পা পঙ্গু হয়ে যায়।

গোটা পৃথিবী জুড়েই এটা লক্ষ্য করা যায় যে, কিছু কিছু বিষয়, বিশেষ করে গণিত, মেয়েরা খুব কম পড়তে আসে। বর্তমানে PET স্ক্যান-এর সাহায্যে এর কারণটাও মোটামুটি বুঝতে পারা গেছে। দেখা গেছে যে ছেলেদের মস্তিষ্কের ডান দিক ও বাঁ দিক সম্পূর্ণ আলাদা। তাই ডানদিকে সঞ্চিত খবর বাঁ দিকে যায় না এবং বাঁ দিকে সঞ্চিত খবর ডান দিকে যায় না। কিন্তু মেয়েদের বেলায় মস্তিষ্কের ডান দিক ও বাঁ দিক সম্পূর্ণ

আলাদা নয়। তাই ডান দিক ও বাঁ দিকের সঞ্চিত স্মৃতি মেশামিশি হয়ে যায়। এর ফলে মেয়েরা স্মৃতি সঞ্চিত রাখার জন্য অপেক্ষাকৃত কম জায়গা পায় এবং তাই তারা বেশি তথ্য বা বেশি জটিল ব্যাপার মনে রাখতে পারে না।

পৃথিবীর কোন দুজন লোক, চেহারার দিক থেকে তো বটেই, চরিত্রের দিক থেকেও পুরোপুরি এক রকম হয় না। কাউকে দেখা যায় খুবই উন্নত চারিত্রিক গুণ সম্পন্ন আবার কাউকে দেখা যায় অত্যন্ত নিষ্ঠুর বা অপরাধপ্রবণ। এইসব ব্যাপারেও বিজ্ঞানীরা কিছু কিছু আলোকপাত করতে শুরু করেছেন। দেখা গেছে যে জন্ম থেকে ৩ বছর বয়সের মধ্যে শিশুর মনে যে ছাপ পড়ে বা মস্তিষ্কে যে সব নক্‌শার সৃষ্টি হয় তা সহজে মুছে যায় না। এই কারণে তিন বছর বয়স পর্যন্ত শিশুকে খুব বকাবকি করা বা মারধর করা একেবারেই উচিত নয়। এই সময় পর্যন্ত তাকে আদর-যত্নে রাখতে হবে এবং এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সে যেন মাথায় কোন বড় ধরনের আঘাত না পায়। দশ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর মস্তিষ্কে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি নিউরন তৈরী হয় এবং তারা যেসব নক্‌শার সৃষ্টি করে তাতেই তার ভবিষ্যৎ চরিত্র তৈরী হয়ে যায়। এই বিশেষ ধরনের নক্‌শাগুলো অনেকটা ছাঁকনীর মতো কাজ করে। যার ফলে ওই ধরনের নক্‌শা ছাড়া অন্য ধরনের নক্‌শা সৃষ্টি হতে পারে না। বাহ্যিক দিক থেকে শিশুর মনও এমন ভাবে তৈরী হয়ে যায় যে, যেসব কাজ শুধু ওই ধরনের নক্‌শা তৈরী করবে সেই সব কাজেই তার আগ্রহ ও প্রবণতা দেখা যায়। দশ বছর পর থেকে অপ্রয়োজনীয় নিউরনগুলো মরে যেতে থাকে। কিন্তু যেগুলো বেঁচে থাকে, সেগুলো আরও শক্তিশালী ও কর্মক্ষম হয়। এই সময়ের মধ্যে কি কি ধরনের নক্‌শা তার মাথায় পাকাপাকি ভাবে বসবে এবং চরিত্র তৈরী করবে তা নির্ভর করে তার জন্মগত 'জিন' এবং বাকিটা পরিবেশের ওপর।

বিভিন্ন মানসিক রোগের কারণ নির্ণয়ের ব্যাপারেও 'MRI' ও 'PET' -এর সাহায্য নেওয়া শুরু হয়েছে এবং বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, আগামী দশ বছরের মধ্যেই মানসিক রোগের চিকিৎসার ব্যাপারেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। কিন্তু এর থেকেও বড় কথা হল যে, উপরিউক্ত কারিগরী স্নায়ুবিদ্যার গবেষণার ব্যাপারে এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। মানুষের যেসব চিরন্তন জিজ্ঞাসার আজও কোন বৈজ্ঞানিক উত্তর পাওয়া যায়নি, বা যেসব প্রশ্ন নিয়ে বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের মধ্যে আজও প্রবল মতানৈক্য রয়েছে, বিজ্ঞানীরা মনে করেন সেসব প্রশ্নেরও বিজ্ঞান ভিত্তিক উত্তর দেওয়া কঠিন

কাজ হবে না। মন কি? বুদ্ধি বিচক্ষণতা বা কর্তব্য অকর্তব্য স্থির করার ক্ষমতা, অনুভূতি, আবেগ, অহংজ্ঞান ইত্যাদি ব্যাপারগুলো মস্তিষ্কের কোথায় কি ভাবে সৃষ্টি হয়? সর্বোপরি চৈতন্য বা চেতনা, যা আমাদের সর্বপ্রকার আবেগ অনুভূতির মূল, সেই চেতনা বলতে আমরা কি বুঝি ইত্যাদি দার্শনিক ও মনোবিজ্ঞানের প্রশ্নগুলির কোন জড়বাদী ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব কিনা সে ব্যাপারেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে।

মন কি? অ্যারিস্টটলের মতে মনের সঙ্গে প্রাণ গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত, কারণ যার প্রাণ নেই তার মনও নেই। প্রাণের সঙ্গে আবার শরীরের উষ্ণতা গভীরভাবে যুক্ত। যেহেতু এই উষ্ণতার উৎস রক্ত তাই অ্যারিস্টটলের মতে হৃৎপিণ্ডই হল প্রাণ ও মনের বাসস্থান। কিন্তু প্ল্যাটো মনে করতেন যে, মনের অবস্থান মানুষের মস্তিষ্কে এবং তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে মধ্যযুগের উয়োরোপীয় দার্শনিকরাও মনে করতেন যে মস্তিষ্কই মনের বাসস্থান। কিন্তু ১৭শ শতাব্দীতে দার্শনিক রেনে ডেকার্টে বলেন যে, মন বস্তুগত নয় এবং শরীর ও মন সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা।

ডেকার্টে একদিন শীতকালে ফায়ার প্লেসের সামনে সোফায় বসে নানা রকম চিন্তা করছিলেন। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল যে, তাঁর শরীরের অবস্থানকে খুব সহজেই তাঁরই আবিষ্কৃত 'স্থানাঙ্ক জ্যামিতি'র (Coordinate Geometry) সাহায্যে নিখুঁত ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। কিন্তু তাঁর মনকে তো সেরকম ভাবে কোন স্থানে আবদ্ধ করা সম্ভব নয়। এ থেকেই তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, শরীর ও মন সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা। কিন্তু ডেকার্টের এই সিদ্ধান্ত ঠিক নয়, কারণ মন বস্তুগত না হলেও বাস্তব শরীরের সঙ্গে তার নিবিড় সম্বন্ধ রয়েছে। শরীর ভাল থাকলে মন ভাল থাকে এবং শরীর খারাপ হলে মনও খারাপ হয়। এছাড়া শরীরের উপরও মনের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। (এই কারণে আমরা পরে দেখবো যে ভারতীয় ঋষি মনকে শরীরের ইন্দ্রিয় বলেছেন) কিন্তু ডেকার্টের বিখ্যাত উক্তি "আমি চিন্তা করি তাই আছি"-এর সঙ্গে আমাদের ভারতীয় ভাবনা-চিন্তার মিল আছে। এখানে "আমি" বলতে আমার জৈবিক দেহকে বোঝায় না। কারণ তার কোন চিন্তা করার ক্ষমতা নেই। এই "আমি" হল আমাদের আত্মবুদ্ধি, অহংকার, আত্মা ও শেষ পর্যন্ত আমাদের চেতনা বা চৈতন্য। কাজেই চিরস্থায়ী আত্মা বা চৈতন্যটাই আমি, স্থূল শরীরটা আমি নয়, এ সিদ্ধান্ত হিন্দু দর্শনের মূল ভিত্তি।

কাজেই সব থেকে মূল প্রশ্ন হল, আমাদের চেতনার উৎস কি, অথবা চেতনা বলতে আমরা কি বুঝি? এ ব্যাপারে ডঃ দামাসিওর মত হল, নিউরনগুলোর কাজকর্ম

নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমাদের মস্তিষ্কে লক্ষ লক্ষ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র (Convergence Zone) আছে এবং এরা আমাদের স্মৃতি, অনুভূতি, আবেগ ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোর মাধ্যমে নিমেষের মধ্যে যে সমস্ত অসংখ্য সংবাদ দ্রুতগতিতে আমাদের মস্তিষ্কে চলে আসছে, ওই নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রগুলো সেগুলোকে যথোপযুক্তভাবে বিন্যস্ত করে অনুভূতিকে একটা সম্পূর্ণতা দান করছে এবং একেই আমরা চৈতন্য বলি। ডঃ দামাসিওর মতে, চৈতন্য, আত্মবুদ্ধি বা অহংজ্ঞান সব একই ব্যাপার এবং বাহ্যিক উদ্দীপনার দ্বারা এগুলো প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে।

অন্যান্য বস্তুবাদী বিজ্ঞানীরাও দামাসিওর মতো প্রায় একই মতবাদে বিশ্বাসী। ক্যালিফোর্নিয়া ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজির বিজ্ঞানী ডঃ ক্রিস্তফ কখ্ মনে করেন, ইন্দ্রিয়গুলোর মাধ্যমে যেসব অসংখ্য উদ্দীপনা অনবরত আমাদের মস্তিষ্কে ঢুকছে তারা প্রত্যেকেই উচ্চ কম্পাঙ্কের বিদ্যুৎ স্পন্দন সৃষ্টি করছে এবং এই সব তড়িৎ স্পন্দনের সামগ্রিক ফলকেই (Mesh) আমরা চৈতন্য বলি। 'ডি এন এ'র আণবিক গঠনের আবিষ্কর্তা, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ডঃ ফ্রান্সিস ক্রিকও প্রায় একই প্রকার মতে বিশ্বাসী। তিনি তাঁর "The astonishing Hypotheses" নামক গ্রন্থে এই মত ব্যক্ত করেন যে, প্রকৃতপক্ষে আমাদের স্বাধীন চিন্তা, অহং বুদ্ধি, অনুভূতি, আবেগ এবং সর্বোপরি আমাদের চৈতন্যের পিছনে কোন অপ্রাকৃত কারণ নেই। মস্তিষ্কের কোষগুলো ও স্নায়ুর কোষগুলোর কাজকর্মের এগুলো এক সামগ্রিক ফল। কাজেই এসবের মূল কারণ বাস্তব ও প্রাকৃতিক। রামধনু যেমন জলকণা ও আলোর এক প্রকৃতির খেলা হলেও তাকে যেমন ধরা-ছোঁয়া যায় না, চৈতন্যও তাই।

কিন্তু চৈতন্য কি শুধুই, ডঃ দামাসিওর মতানুযায়ী, মস্তিষ্কের নিউরন কেন্দ্রগুলির কাজের সমন্বয়? বা ডঃ কখ্ -এর মতানুযায়ী উচ্চ কম্পাঙ্কের তড়িৎ স্পন্দনের সমষ্টিগত ফল? বা ডঃ ক্রিক -এর মতানুযায়ী মস্তিষ্ক ও স্নায়ুকোষগুলির কাজের সামগ্রিক ফল? মনস্তত্ত্ববিদ ডঃ স্টুয়ার্ট সুদারল্যান্ড তাঁর "International Dictionary of Psychology" গ্রন্থে বলেন, "Consciousness is a mysterious phenomenon and it is impossible to specify it"—অর্থাৎ চৈতন্য হল খুবই রহস্যময় ও বিস্ময়কর ব্যাপার যাকে স্বতন্ত্রভাবে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব।

এইসব বিষয়ে যাঁরা বহুদিন ধরে কাজ করছেন, এইরকম সাবেক বিজ্ঞানীরাও ডঃ সুদারল্যান্ডের মতোই অভিমত ব্যক্ত করে থাকেন। তাঁরা বলেন যে, মস্তিষ্ক বা

স্নায়ুর ক্রিয়া-বিক্রিয়া চৈতন্য নয়, চৈতন্য হল এইসব ক্রিয়া-বিক্রিয়ারও মূলীভূত কারণ। তাঁদের মতে "There is no conceivable place for the sense of self or consciousness to be located in the brain and it is like a man acting behind the curtain—some kernel of awareness that runs the show"—মস্তিষ্কের মধ্যে এমন কোন জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবে না যে দেখা যাবে আমাদের চৈতন্য সেখানে লুকিয়ে আছে। চৈতন্য যেন একজন মানুষ যে পর্দার আড়ালে থেকে পুরো খেলাটা পরিচালনা করছে। এইসব সাবেক বিজ্ঞানীদের সর্বশেষ অভিমত হল, "And hence a search for consciousness, as a material entity is bound to lead to the conclusion that it simply does not exist"—অর্থাৎ চৈতন্যকে বাস্তব বা প্রাকৃত সত্তা হিসাবে ধরে নিয়ে কোন অনুসন্ধান চালালে তা এই সিদ্ধান্তে পর্যবসিত হতে বাধ্য যে, চৈতন্য বলে কিছু নেই।

মন, বুদ্ধি, আত্মা, চৈতন্য ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করার ভারতীয় পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য পাশ্চাত্য উদ্দেশ্য থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। পাশ্চাত্যের দার্শনিকদের উদ্দেশ্য হল, বিষয়গুলো নিয়ে তর্কের টেবিলে তর্ক করা। তর্কের মাধ্যমে নিজের জ্ঞানগম্মি জাহির করা। কিন্তু আমাদের দেশের সত্যান্বেষী মুমুক্ষুরা এই সব আলোচনা করেছেন সত্য দর্শনের জন্য, ভগবৎ দর্শনের জন্য, ভগবৎ কৃপা লাভের জন্য, পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের মতো 'ভেক কোলাহল' করার জন্য নয়। কাজেই তাঁদের চিন্তা, তাঁদের সিদ্ধান্ত শুধু নীরস শুষ্ক জ্ঞান নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও ঈশ্বর দর্শনের সত্যে ভরপুর। আমাদের শাস্ত্র তৈরী হয়েছে প্রকৃত দ্রষ্টাদের দ্বারা। তাই হাজার হাজার বছর আগেও তা সত্য ছিল, আজও তা সত্য আছে এবং হাজার হাজার বছর পরে ভবিষ্যতেও তা সত্য থাকবে। তোমার অনেক জ্ঞান হয়েছে কিন্তু সত্য দর্শন হয়েছে কি? যদি না হয়ে থাকে, তবে তোমার ঐ শুষ্ক জ্ঞান শুষ্ক তৃণের মতই পরিত্যাজ্য।

প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় মনীষা সর্বকালেই এই নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী ভৌতিক জগতের পিছনে যে শাশ্বত সত্য আছে তারই অনুসন্ধান করেছে, সাধনা করেছে, জীবনপাত করেছে। যদি তাঁরা প্রাকৃত জড় এই লৌকিক সংসার নিয়ে মাথা ঘামাতেন, তাহলে এই ভারতের মাটিতে অসংখ্য নিউটন, অসংখ্য আইনস্টাইন তৈরী হতে পারতো, এব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। বেশি অতীতে যাবার প্রয়োজন নেই। ইদানীংকালের

শ্রীশঙ্করাচার্য বা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতো ধীশক্তি সম্পন্ন পুরুষ পাশ্চাত্যে যদি একজনও জন্মগ্রহণ করতেন তবে তাঁদের আস্ফালনে আকাশ বাতাস মুখরিত হতো। ভারতের এইসব ক্ষণজন্মা পুরুষরা ভারতের ধর্ম ও দর্শনকে যেসব অমূল্য রত্নে সমৃদ্ধ করে গেছেন, তা বলতে গেলে বিশ্বের বিস্ময়। পাশ্চাত্যের ফ্রয়েড সাহেব মনের তিনটি অবস্থার কথা বলে গেছেন। আমাদের মধ্যে যাঁরা নিজের দেশের মনীষীরা কি বলে গেছেন, তার কোন খোঁজ খবর রাখেন না, তাঁরা নেচে উঠে বলবেন যে, আহা মনের কি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণই না ফ্রয়েড করে গেছেন। কিন্তু সমাধি অবস্থায় মনের কি অবস্থা হয় তা ফ্রয়েড সাহেবের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কারণ, শরীর-মনের যে পবিত্রতায় সমাধি হয় সেই রকম পবিত্র মন ফ্রয়েড সাহেবের দেশে জন্মায় না। তাই তা জানতে হলে পাতঞ্জল যোগের বই-ই খুলতে হবে। হঠাৎ কাউকে জোর করে ধাক্কা মেরে গভীর ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললে তখন তার মনের অবস্থা কি হয় তা ঋষি পতঞ্জলীই বিশ্লেষণ করেছেন, ফ্রয়েড করেননি।

পাশ্চাত্যের দার্শনিকদের কাছে মনই হল সবথেকে দুর্জ্ঞেয় বিষয়। কারণ, মনের থেকেও যা দুর্জ্ঞেয়, তাতে প্রবেশ করার মতো মেধার সূক্ষ্মতার তাঁদের খুবই অভাব। সবথেকে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, পাশ্চাত্যের সেই দুর্জ্ঞেয় মন ভারতের ঋষির কাছে একটা ইন্দ্রিয়মাত্র। পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং আন্তর ইন্দ্রিয় মন হল একাদশ ইন্দ্রিয়। কাজেই ভারতীয় মতে ডেকার্টের সিদ্ধান্ত ভুল। কারণ, মন শরীর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা নয়। যেহেতু মন বস্তুগত নয় তাই বিজ্ঞানীরা যতই তন্ন তন্ন করে খুঁজুন না কেন, মস্তিষ্কের মধ্যে কোথায় মনের অবস্থান তা খুঁজে বার করা সম্ভব নয়। ঠিক তেমনি, মস্তিষ্কের মধ্যে কোথায় আমাদের আত্মভাব বা অহংবোধ, ইংরাজীতে যাকে বলে Sense of self, লুকিয়ে আছে তাও বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। যেহেতু এই Sense of self-এর মূলে রয়েছে চৈতন্য বা consciousness, তাই সেই চৈতন্যকেও জড়বাদী বিজ্ঞানীদের পক্ষে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যায়ের বিজ্ঞানী গিলবার্ট রাইল-এর মতে মানুষের আত্মার কোন অস্তিত্ব নেই, এবং এ যেন মানুষ নামক যন্ত্রের মধ্যে এক প্রেতাত্মার অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে। সাংখ্য দর্শনের প্রণেতা ঋষি কপিল বলেছেন, "অস্ত্যাত্মা নাস্তিত্বসাধনাভাবাৎ" বা আত্মা নেই-এর সপক্ষে যেহেতু তেমন কোন দৃঢ় প্রমাণ নেই তাই দৃঢ় সিদ্ধান্ত করা চলে যে আত্মা আছে। কিন্তু এই আত্মা "দেহাদিব্যতিরিক্তোঽসৌ

বৈচিত্র্যাৎ" বা বিচিত্রতা হেতু শরীরাদির অতিরিক্ত। এর সপক্ষে প্রমাণ কি? তখন তিনি বলেছেন, "ষষ্ঠী ব্যাপদেশাদপি"—অর্থাৎ আমাদের শরীরের কোন অংশকে নির্দিষ্ট করতে আমরা সব সময় ষষ্ঠী বিভক্তি করি, যেমন আমার হাত, আমার পা। শুধু তাই নয়, আমার মন, আমার বুদ্ধি ইত্যাদি। এ থেকেপ্রমাণ হয় আত্মা ও শরীর পৃথক। অর্থাৎ প্রকৃত 'আমি' বা Sense of Self শরীর থেকে পৃথক। এ ব্যাপারে লক্ষণীয় যে, পাতঞ্জল যোগে ধ্যানের প্রথম শিক্ষাই হল আসনে বসে এই চিন্তা করা যে, আমি ও আমার শরীর পৃথক। এটা ভালোভাবে বোঝাবার জন্যই গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন, "বাসাংসি জীর্ণানি" ইত্যাদি। অর্থাৎ পোশাক-পরিচ্ছদ যেমন আমাদের শরীর থেকে আলাদা, তেমনি প্রকৃত আমিও শরীর থেকে পৃথক। কাজেই জড় বিজ্ঞানীরা এই আমিকে মস্তিষ্কের মধ্যে খোঁজ করে যে গলদঘর্ম হবেন তাতে আর আশ্চর্য কি?

জীবের এই আত্মবুদ্ধি বা জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্পর্ক কি? এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ভারতীয় মনীষীরা যে পরিমাণ চিন্তা-ভাবনা, চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন, তা এক বিস্ময়ের ব্যাপার। অদ্বৈতবাদীদের মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই। কোন ভেদ নেই। "স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"। জীবাত্মাও পূর্ণ, পরমাত্মাও পূর্ণ, "ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং"। বিশিষ্টাদ্বৈত মতে জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ বটে, তাই বলে অভেদ নয়, ভেদ আছে। পরমাত্মা লোহার উত্তপ্ত পিণ্ড এবং জীবাত্মা তার ফুলকি, "নিঃসরন্তি যথা লৌহপিণ্ডা-তপ্তবৎ স্ফুলিঙ্গকাঃ।" সূর্যের প্রতিবিম্ব সব জলকণাতেই দেখা যায়, তাই বলে তারা আসল সূর্যের সমান নয়, "জলাধারেম্বিবাংশুমান্"। গ্লাসে করে সমুদ্রের জল নিয়ে এলে তাকে সমুদ্রের জল না বলে উপায় নেই। কিন্তু সেই গ্লাসের মধ্যে সমুদ্রের বিশালতা, তর্জন-গর্জন অনুপস্থিত।

আজ থেকে ৫০০ বছর আগে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এ ব্যাপারে শেষ মীমাংসা করে গেছেন। তাঁর মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে ভেদ অভেদ দুই-ই আছে, তবে তা মানুষের বুদ্ধির অগম্য বা অচিন্ত্য। এই কারণে তাঁর মতবাদের নাম অচিন্ত্য ভেদাভেদ। ভারতের ভক্তিবাদীরা কখনই অদ্বৈতবাদীদের মতো নিজেকে পরমাত্মার সঙ্গে সমান ভাবতে রাজী নন, "নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়।"

যাই হোক, ভারতীয় দর্শন মতে, সেই এক চৈতন্যময় সত্তা ব্রহ্ম থেকেই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। ব্রহ্মই এই সৃষ্টির লালন-পালন করেছেন। আবার প্রলয়কালে সেই ব্রহ্মেই সব লীন হয়ে যাবে।

ব্রহ্ম হতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মাতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়।।

কাজেই যে চৈতন্যকে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, ভারতীয় মতে সেই চৈতন্যই হল সৃষ্টির আদি কারণ। এই সৃষ্টির মূল উপকরণ। জগৎ নশ্বর, জগতের সৃষ্টি ও লয় আছে। কিন্তু জগতের মূল উপকরণ, চৈতন্যময় সত্তা ব্রহ্মের জন্ম-মৃত্যু, সৃষ্টি-প্রলয় নেই।

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি।।

কাজেই ভারতীয় মতে শুধু জীবন্ত প্রাণী নয়, অজীব বস্তুরও মূল উপকরণ সেই একই চৈতন্যময় সত্তা। তাই এই বিশ্বজগতে দৃশ্য যা কিছু আছে, প্রতিটি ধূলিকণা, প্রতিটি অণু-পরমাণুও চৈতন্যময়, "ইন্দ্রিয়ানাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা।"

কাজেই পাশ্চাত্যের ধ্যনধারণা থেকে ভারতীয় মত যে কত ব্যাপক ও সম্পূর্ণ, তা সহজেই অনুমান করা চলে। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীদের মতে মস্তিষ্ক ও মস্তিষ্কের নিউরনগুলোর কার্যকলাপের সমষ্টিগত ফলই চৈতন্য। তাহলে ধরে নিতে হয় যে, যে সব প্রাণীর মস্তিষ্কের নিউরন নেই, তাদের চৈতন্য নেই। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, এককোষী প্রাণী এ্যামিবারও চৈতন্য আছে। এ্যামিবাও খিদে পেলে খাবার ধরে খায়, এককোষ থেকে দুইকোষে ভাগ হয়ে প্রজনন করে। বিজ্ঞানের মতে নিউরন ও স্নায়ু-কোষ ছাড়া চৈতন্য নেই। কিন্তু আমাদের রক্তের শ্বেত কণিকারা যখন বহিরাগত জীবাণু ধরে খায়, তখন তার সঙ্গে কোন স্নায়ুর যোগ থাকে কি?

পাশ্চত্যের জড় বিজ্ঞানীদের পক্ষে এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়া যতখানি কঠিন, ভারতীয় মতে এসব ব্যাখ্যা করা ঠিক ততখানিই সহজ। চৈতন্যই যেহেতু এই সৃষ্টির মূল উপকরণ, তাই শরীরের প্রতিটি কোষ তো বটেই, কোষগুলো যা দিয়ে তৈরী সেই প্রতিটি অণু-পরমাণুও চৈতন্যময়। শুধু তাই নয়, পরমাণুগুলো যা দিয়ে তৈরী সেইসব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণারাও চৈতন্যময়। কাজেই এ্যামিবার চৈতন্য থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি? অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক ডঃ পেনরোজ হয়তো নিজের অজান্তেই ভারতীয় বেদান্তের মত গ্রহণ করে বলেছেন, "Consciousness may arise from quantum mechanical phenomena—the laws that govern the behaviour of

subatomic particles" অর্থাৎ পরমাণুর গঠনকারী ক্ষুদ্র কণারা কোয়ান্টাম বিজ্ঞানের যেসব নিয়মকানুন দ্বারা পরিচালিত হয়, সেই সব নিয়ম-কানুনগুলিই হয়তো চৈতন্যের কারণ হতে পারে।

আমাদের ঋষিরা হাজার হাজার বছর আগে এ সিদ্ধান্ত করে গেছেন যে, সৃষ্টির মূল যে চৈতন্যময় সত্তা, তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন, "ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈঃ"। অর্থাৎ তিনি চক্ষু, বাক্ অথবা অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য নন। তাহলে সেই ইন্দ্রিয়ের অগোচর চৈতন্যকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিজ্ঞান কেমন করে জানবে ? যে চৈতন্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের কাছে মস্তিষ্কের ক্রিয়া-বিক্রিয়া মাত্র, ভারতীয় মতে সেই চৈতন্য হল সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতির সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা, সর্বেশ্বর ভগবান। তাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিজ্ঞান তাকে কেমন করে জানবে?

কিছুদিন আগে গ্যারি কাসপারভ ও আই বি এম কোম্পানীর Deep Blue সুপার কমপিউটারের মধ্যে দাবা খেলা হয় এবং প্রথম খেলায় কাসপারভ হেরে যান। এতে খুব হৈ চৈ পড়ে যায় এবং বিজ্ঞানীদের মধ্যে এ নিয়ে জোর বিতর্কের সূত্রপাত হয় যে, বুদ্ধিমান যন্ত্র তৈরি করা সম্ভব কিনা। অর্থাৎ এমন বুদ্ধিমান যন্ত্র তৈরি করা সম্ভব কিনা যে নিজে কিভাবে চলছে তা বুঝতে পারবে ও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। সোজা করে বললে এই দাঁড়ায় যে, এমন মোটর গাড়ি কি বানানো সম্ভব, যে সে বুঝতে পারবে তেল জ্বালিয়ে চাকা ঘুরিয়ে সে কেমন করে, কোন্ নিয়মে চলছে? বেশিরভাগ বিজ্ঞানীই এ মত ব্যক্ত করেন যে—না, এরকম মোটরগাড়ি বা যন্ত্র বানানো সম্ভব নয়। তাহলে এই দাঁড়ায় যে, মানুষ নামক যন্ত্রের পক্ষেও এটা জানা সম্ভব নয় যে, সে কোন্ শক্তির দ্বারা কেমন করে চলছে। অর্থাৎ যে চৈতন্য শক্তি দ্বারা মানুষ চলছে, তাকেও মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে ডঃ পেনরোজের মন্তব্য খুব সুন্দরভাবে মিলে যায়—"Perhaps human mind will never be able to comprehend human mind"।

এই কথাটিই কয়েক হাজার বছর আগে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য পত্নী মৈত্রেয়ীকে বলেছিলেন, "তৎ কেন কং বিজানীয়াদ্ যেনেদং সর্বং বিজানাতি"—অর্থাৎ প্রিয়ে, যাঁর সাহায্যে সব কিছু জানতে পারছ তাঁকে কেমন করে জানবে?

তাহলে তাঁকে জানার কি কোন উপায় নেই? উপায় আছে। সেই চৈতন্যময় সত্তা একই, কিন্তু বৈদান্তিকের কাছে তিনি ব্রহ্ম, যোগীর কাছে তিনি আত্মা এবং

ভক্তের কাছে ভগবান। কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবের কাছে আবার কৃষ্ণই পরমব্রহ্ম, কৃষ্ণই পরমাত্মা, কৃষ্ণই সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান।

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান কৃষ্ণের বিহার।
এ অর্থ না জানি মূর্খ অর্থ করে আর।।

উপনিষদ বলছে, "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম"—অর্থাৎ সেই পরমাত্মা যাকে দয়া করেন, একমাত্র সেই-ই তাঁকে জানতে পারে। তিনি দয়া কাকে করেন? একমাত্র একনিষ্ঠ ভক্তকেই তিনি কৃপা করে আপন স্বরূপ প্রকট করেন। তাই তিনি অর্জুনকে বলেছেন,

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবম্বিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবিষ্টুঞ্চ পরন্তপ।।

হে পরন্তপ একমাত্র অনন্য ভক্তির দ্বারাই আমাকে দেখা যায়, তত্ত্বত জানা যায় এবং আমাতে বিলীন হওয়া যায়। কাজেই চৈতন্যকে দেখার বা জানার হাতিয়ার হল অনন্য ভক্তি, পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীদের স্থূল জড় যন্ত্রপাতি নয়। "পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া"। সেই পরম পুরুষ, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে প্রতিনিয়ত যাঁরই লীলা চলছে, যিনি "বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্" তাঁকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিজ্ঞান কেমন করে জানবে?

বিজ্ঞানের আক্রমণে পর্যুদস্ত পাশ্চাত্যের রিলিজিয়ান

আশিজন সদস্য বিশিষ্ট 'পন্টিফিকাল অ্যাকাডেমী অফ সায়েন্স' হল খ্রীস্টধর্ম তথা পোপের অনুগত বিজ্ঞানীদের একটি সংস্থা, যার কাজ হল, বিজ্ঞান বিষয়ক ব্যাপারে পোপকে পরামর্শ দেওয়া। গত ১৯৯৬ সালের ২৪ অক্টোবর উক্ত সংস্থা যখন তার ৬০ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন করছিল, তখন পোপ দ্বিতীয় জন পল সমবেত বিজ্ঞানীদের প্রতি তাঁর শুভেচ্ছা বার্তায় ঘোষণা করলেন যে, ডারউইন-এর বিবর্তনবাদের সঙ্গে ক্যাথলিক ধর্মমতের কোন বিরোধ নেই। এই ঘোষণার সপক্ষে তিনি যুক্তি দেখালেন যে, ডারউইনের বিবর্তনবাদী তত্ত্ব এখন আর অনুমানের পর্যায়ে নেই এবং বিশ্বের বেশিরভাগ বিজ্ঞানী এই তত্ত্বকে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন।

পোপের এই ঘোষণা শুধু উপস্থিত বিজ্ঞানীদেরই নয়, সমস্ত বিশ্ববাসীকেই চমৎকৃত করল। বিগত ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগে এই তত্ত্বকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে চার্চের বিবাদ চরম সীমায় পৌছায়। গত শতাব্দীর ষাটের দশকে যখন চার্লস ডারউইন তাঁর "The origin of Species by Natural Selection" এবং "The Descent of Man" নামক গ্রন্থদ্বয় প্রকাশ করেন, তখন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ক্যাথলিক চার্চের মধ্যে বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া প্রবলভাবে দেখা দেয়। বাইবেলের 'জেনেসিস' অধ্যায়ে বর্ণিত সৃষ্টিকার্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হবার ফলে চার্চ ডারউইন ও তাঁর তত্ত্বের প্রতি খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে। আর কয়েকশ বছর আগে হলে কথা ছিল না, হয়তো এই পাপের জন্য তাঁকে পুড়ে মরতে হতো। মাত্র কয়েক বছর আগে ১৯৫০ সালে পোপ দ্বাদশ পায়াস তাঁর 'হিউম্যানী জেনেসিস' গ্রন্থে এই মত ব্যক্ত করেন যে, ডারউইনের তত্ত্বকে সরাসরি নাকচ না করলেই হয়তো চার্চের পক্ষে মঙ্গল হতো।

বাইবেল অনুসারে গড ছয়দিনের মধ্যে সমস্ত সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন করেন এবং ইসলাম ও ইহুদীদের ধর্ম জুদাইসম্‌ও এই মতে বিশ্বাসী। ইসলামী মতে নবী মহম্মদ আদি মানব-মানবী আদম ও ইভের ৯০তম বংশধর। কাজেই দুই প্রজন্মের মধ্যে ৩০ বছর বয়সের তফাত ধরলে মেনে নিতে হবে যে, আজ থেকে ৪৩২৭ বছর আগে গড বা আল্লাহ্ এই সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন করেছিলেন। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ডারউইনের তত্ত্ব বাইবেল বা কোরান বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের মূলে কুঠারাঘাত করেছে এবং পোপ

ডারউইনের তত্ত্বকে মান্যতা দিয়ে প্রকারান্তরে বাইবেলের প্রথম অধ্যায় 'জেনেসিস'কে সমূলে উৎখাত করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, পোপের উক্ত ঘোষণা সমস্ত খ্রীস্টান জগৎকে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক সমস্যার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। বাইবেলের মতে গড প্রথম মানব আদমকে সৃষ্টি করার পর তার মধ্যে আত্মা ফুঁকে দেন এবং তাই শুধু মানুষের মধ্যেই আত্মা আছে, ইতর প্রাণীদের মধ্যে নেই। কাজেই ডারউইনের মত অনুযায়ী মনুষ্যেতর বানর জাতীয় প্রাণী থেকে মানুষের ক্রমবিকাশের কোন পর্যায়ে গড মানুষের মধ্যে আত্মা ফুঁকে দিয়েছিলেন তা নির্ণয় করা সত্যিই কঠিন হয়ে পড়ে। সাংবাদিকেরা এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে পোপ প্রথমে তা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেন এবং সাংবাদিকরা চেপে ধরলে বলেন, "যদি মনুষ্যেতর প্রাণী থেকে মানুষের উদ্ভব হয়ে থাকে তবে মানুষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই গড আত্মা সৃষ্টি করেন।" তিনি আরও বলেন যে, "ডারউইনের বিবর্তনবাদ মানুষের আত্মার ব্যাপারে কোন গুরুত্ব দেয় না এবং ইতর প্রাণী থেকে মানুষের সম্ভ্রমকে পৃথক করে দেখার চেষ্টা করে না।

সৃষ্টির ব্যাপারে হিন্দু মত কি বলে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে দু-একটি কথা বলা সমীচীন হবে। মাত্র ৪০০০ বছর আগে এই বিশ্ব জগতের সৃষ্টি হয়েছে এমন হাস্যকর কথা হিন্দুশাস্ত্র বলে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন—

সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ।।
অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে। (৮/১৭-১৮)

অর্থাৎ পার্থিব ১০০০ যুগ ব্রহ্মার ১ দিন এবং ওই ১০০০ যুগে ব্রহ্মার ১ রাত্রি। ব্রহ্মার দিনে দৃশ্যমান জগৎ অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত হয় এবং ব্রহ্মার রাত্রিতে পুনরায় ব্যক্ত অবস্থা থেকে অব্যক্ত অবস্থায় ফিরে যায় বা লয় হয়। কপিলমুনি তাঁর সাংখ্য দর্শনে একই কথা বলেছেন। সৃষ্টির মূল উপাদান 'মূলপ্রকৃতি' হল সত্ত্ব, রজঃ ও তম গুণের সাম্যাবস্থা। পুরুষের চরম অহংকারের ফলে এই সাম্যাবস্থা নষ্ট হলে অব্যক্ত প্রকৃতি ব্যক্ত হয় এবং আবার যখন প্রকৃতি তার সাম্যাবস্থায় ফিরে আসে তখন ব্যক্ত প্রকৃতি অব্যক্ত মূল প্রকৃতিতে ফিরে যায়। উপরিউক্ত শ্লোক দুটিতে ভগবান সাংখ্য মতই গ্রহণ করেছেন। এটা পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় যখন পরবর্তী ৯ম অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলেন—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে।। (৯/১০)

হিন্দুর ভগবান বলেন যে, জীব অজীব সর্বভূতের তিনিই বীজ, 'বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্', সুতরাং মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যেও আত্মা থাকবে তাতে আর বিচিত্র কি ?

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ।। (ঐ ৭/৫)

তবে কি মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে কোন প্রভেদ নেই? আছে, হিন্দু বলে মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণী, সব এক চৈতন্যময় সত্তারই ভিন্ন রূপ। তবে মানুষের মধ্যে অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, জ্ঞানবিজ্ঞানময় কোষ এবং আনন্দময় কোষ বিদ্যমান। কিন্তু মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানময় কোষ এবং আনন্দময় কোষ অনুপস্থিত।

যাই হোক, ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখতে গেলে বিজ্ঞানের সঙ্গে ক্যাথলিক চার্চের বিবাদের সূত্রপাত হয় ১৬শ শতাব্দীতে। যখন কোপার্নিকাস তাঁর সূর্যকেন্দ্রিক গ্রহমণ্ডলীর তত্ত্ব প্রকাশ করেন। এর প্রায় ১০০ বছর পর জোহানেস কেপলার উক্ত তত্ত্বকে দৃঢ় গাণিতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে চার্চের ভূকেন্দ্রিক মতবাদকে ধূলিসাৎ করেন। কিন্তু কোপার্নিকাসকে কোনরকম সাজা দেওয়া চার্চের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কারণ, কোপার্নিকাস নিজেই ছিলেন চার্চের একজন যাজক (ক্যানন)। কাজেই চার্চের পক্ষে প্রথমে এটা বিশ্বাস করাই সম্ভব হয়নি যে, তিনি নিজে চার্চের একজন কর্তাব্যক্তি হয়ে চার্চের বিরুদ্ধে কোন মতবাদ প্রচার করতে পারেন। যখন চার্চের টনক নড়ল, তখন কোপার্নিকাস ইহধাম ত্যাগ করে চলে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর গ্রন্থ 'রিভলিউশনিবাস' যখন প্রকাশিত হয় তখন তিনি মৃত্যুশয্যায়। পরবর্তীকালে একই মত পোষণ করার ফলে চার্চ ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারে এবং গ্যালিলিওকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। অথচ এর প্রায় হাজার বছর আগে ঠিক একই মতবাদ প্রচার করার জন্য ভারতবর্ষ বিজ্ঞানী আর্যভট্টকে সম্মানিত করে।

মাত্র শ'খানেক বছর আগে পোপ ১৩শ লিও দেখাতে চেষ্টা করেন যে চার্চ বিজ্ঞান-বিরোধী নয় এবং এই উদ্দেশ্যে ভাটিকান মানমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। এসব

সত্ত্বেও চার্চের আরও ১০০ বছর লেগে গেল বিজ্ঞানকে মেনে নিতে এবং অতি সম্প্রতি, মাত্র কয়েক বছর আগে ঘোষণা করা হল যে, গ্যালিলিওর প্রতি দুর্ব্যবহার করে চার্চ অন্যায় করেছিল। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে গত ১৯৮৮ সালে যখন স্যার আইজাক নিউটনের 'প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা' গ্রন্থের ৩০০তম প্রকাশনা বার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হচ্ছিল, তখন পোপ দ্বিতীয় জন পল ঐ গ্রন্থকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এসব ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে ভাটিকান মানমন্দিরের উপাধ্যক্ষ ফাদার মাফেও বলেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে সময় বদলাচ্ছে। আজকের চার্চ অনেক উদার হয়েছে এবং বিজ্ঞানকে মেনে নিচ্ছে। ...বিজ্ঞানের সাহায্যে আজ আমরা বুঝতে পারছি যে আগেকার দিনে যা যা পড়ানো বা বোঝানো হতো তার অনেক কিছুই বাতিল করা দরকার। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, আদিম মানব-মানবী আদম ও ঈভ থেকে বর্তমান মনুষ্য জাতির উদ্ভব হয়েছে তা তিনি বিশ্বাস করেন না। তবে এটা বিশ্বাস করেন যে মানবের ক্রমবিকাশের কোন এক পর্যায়ে গড মানুষের মধ্যে আত্মার অনুপ্রবেশ ঘটান।

এই সকল কথা প্রসঙ্গে ফাদার মাফেও সুযোগ মতো হিন্দু মতবাদকেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। তিনি বলেন যে, বিজ্ঞান যেমন একাধারে খ্রীস্ট মতবাদের পরিবর্তন সাধন করছে, তেমনি পৌত্তলিকতার ও "False Absolute"-এর তত্ত্বকেও সমানভাবে নাকচ করছে। পৌত্তলিকতার কথা বলে তিনি যে সরাসরি হিন্দুদেরই আক্রমণ করেছেন তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কারণ হিন্দুরাই একমাত্র পৌত্তলিক। উপরন্তু False Absolute বলতে তিনি যে অজ নিত্য ও শাশ্বত ব্রহ্মকে বোঝাতে চেয়েছেন, তা বুঝতে বাকি থাকে না। কিন্তু কথা হল এই যে, ফাদার ম্যাফেও হঠাৎ এবং বিশেষ করে হিন্দু তত্ত্বের পিছনে পড়লেন কেন? কারণ একটাই। আজ জড় বিজ্ঞান যা যা আবিষ্কার করছে, বাইবেলের গল্পসল্প দিয়ে তা ব্যাখ্যা করা না গেলেও হিন্দু তত্ত্ব দিয়ে খুব ভালভাবেই ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ খ্রীস্টান ও ইসলামী তত্ত্বকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করছে, কিন্তু হিন্দু তত্ত্বকে মহিমান্বিত ও সমৃদ্ধ করছে। এই সমস্ত কারণে পাশ্চাত্য মনীষীরা বাইবেল ছেড়ে ক্রমেই হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু দর্শনের দিকে ঝুঁকছেন। কাজেই ফাদার ম্যাফেরও মতো লোকেরা বুঝতে পারছেন যে, গায়ের জোরে যে বাইবেলের তত্ত্ব, যে বাইবেলের গল্প এতদিন মানুষকে গেলানো যাচ্ছিল এবং যার দ্বারা তাদের মতো কুনো ব্যাঙেদের করে খাবার কোন অসুবিধে হচ্ছিল না, তার দ্রুত সমাপ্তি এগিয়ে আসছে। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে পোপ জন পল যখন ফ্রান্স ভ্রমণে যান তখন এই শুভেচ্ছা ভ্রমণের প্রতিবাদে দলে দলে লোক ক্যাথলিক ধর্ম ত্যাগ করার

ভয় দেখায়। দক্ষিণ ফ্রান্সের হাজার হাজার লোক গীর্জায় গিয়ে দাবি করতে থাকে যে ক্যাথলিক খাতা থেকে তাদের নাম কেটে দেওয়া হোক এবং খ্রীস্টধর্ম থেকে তাদের মুক্তি দেওয়া হোক। কিন্তু খ্রীস্টধর্ম থেকে বহির্গমনের কোন পন্থা জানা নেই বলে পাদ্রীরা তাদের নামের পাশে এই মন্তব্য নথিভুক্ত করলেন যে, এরা আর খ্রীস্টধর্মে থাকতে চায় না। এর আগে পোপ যখন জার্মানী ভ্রমণে যান, সেখানেও প্রায় একই রকম ঘটনা ঘটে। পক্ষান্তরে বিজ্ঞান হিন্দুর পতাকাকেই উঁচু থেকে আরও উঁচুতে তুলে ধরছে। আর এটাই ফাদার ম্যাফেওর গাত্রদাহের কারণ। কিন্তু যতই গাত্রদাহ হোক না কেন, সত্য টিকে থাকবে এবং মিথ্যা ধূলিসাৎ হবে, এটাই নিয়ম। যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই খ্রীস্টমতকে কবরের দিকে আরও একধাপ এগিয়ে দেবে এবং পক্ষান্তরে হিন্দু মতকে মহিমায় উজ্জ্বল করবে সেটাই এখন বলবো।

প্রাচীনপন্থী জীব বিজ্ঞানীদের মতে, জীবন একটি ব্যতিক্রম এবং সম্ভবত একমাত্র এই পৃথিবীতেই তার আস্তিত্ব আছে। কিন্তু অপর যে মত ক্রমেই বিজ্ঞানীদের কাছে আদরণীয় হয়ে উঠছে তা হল, অণু-পরমাণুর যে জটিল বিক্রিয়াকে আমরা প্রাণ বা জীবন আখ্যা দিই, উপযুক্ত ও অনুকূল পরিবেশে তা যে কোন জায়গায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পেতে পারে। তাই এই সমস্ত বিজ্ঞানীদের মতে জীবন সর্বব্যাপী। কিন্তু এই মত খ্রীস্ট ধর্মের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কারণ, বাইবেল বলছে, গড একমাত্র এই পৃথিবীতেই জীবন সৃষ্টি করেছেন, তাই জীবন শুধু এই পৃথিবীতেই আছে। কাজেই বিজ্ঞানীরা যদি পৃথিবী ছাড়া অন্য কোথাও জীবনের সন্ধান পান, তবে এটাই প্রমাণ হবে যে, দ্বিতীয় কোন গড সেই জীবন সৃষ্টি করেছেন। শুধু তাই নয়, বহির্বিশ্বের সেই প্রাণী যদি বেশি বুদ্ধিমান বা বেশি উন্নত হয় তবে এটাই প্রমাণ হবে যে, সেই দ্বিতীয় গডের থেকে বাইবেলের গড অনেক নিম্ন শ্রেণীর।

এই সৌর জগতে পৃথিবীর অবস্থান, বিশেষ করে সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যেকার দূরত্ব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ঐ দূরত্ব একটু বেশি হলে সব জল জমে বরফ হয়ে যেত এবং একটু কম হলে বাষ্প হয়ে উড়ে যেত। এই কারণে একমাত্র পৃথিবীতেই জল তরল অবস্থায় আছে এবং এই কারণেই পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব সম্ভব হয়েছে। কাজেই বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে জলের তরল অবস্থায় থাকা জীবন সৃষ্টির সর্বাপেক্ষা প্রাথমিক শর্ত। সুতরাং এটা অনুমান করা খুবই যুক্তিসঙ্গত যে, এমন যদি কোন গ্রহ থাকে যা

অনেক দূরের কোন নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে ঘুরছে এবং যেখানে জল তরল অবস্থায় আছে তবে সেখানেও প্রাণের উদ্ভব সম্ভব। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, 'ছায়াপথ গ্যালাক্সী'-তে প্রায় দশহাজার কোটি নক্ষত্র আছে (সূর্য এই ছায়াপথ গ্যালাক্সীর অন্তর্ভুক্ত একটি নক্ষত্র) এবং এই দশহাজার কোটি নক্ষত্রের বেশ কয়েক হাজার কোটি গ্রহ থাকা সম্ভব।

কয়েক বছর আগে 'নাসা'র বিজ্ঞানীরা হাবল্ টেলিস্কোপ নামে একটা দূরবীন মহাকাশে পাঠান। এই দূরবীনের সাহায্যে মহাকাশের খুব সুন্দর সুন্দর ছবি পৃথিবীতে পাঠানো সম্ভব হচ্ছে, যা এতদিন পৃথিবীস্থিত কোন দূরবীনের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কি করে বিশাল বিশাল মহাজাগতিক বস্তুকণার মেঘ আস্তে আস্তে জমাট বেঁধে নক্ষত্র ও গ্রহমণ্ডলীর সৃষ্টি করে, তা এই সব ছবিতে খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এইসব ছবি দেখে বিজ্ঞানীরা অনুমান করতে শুরু করেছেন যে, ছায়াপথের সমস্ত নক্ষত্রেরই নিজস্ব গ্রহমণ্ডলী আছে। কাজেই এইসব গ্রহের মধ্যে জল তরল অবস্থায় আছে এমন গ্রহের সংখ্যাও বেশ কয়েক কোটি থাকা সম্ভব। ইদানীং কালের কিছু কিছু আবিষ্কারও এই অনুমানের সপক্ষে রায় দিচ্ছে।

আজকের অতিশয় শীতল ও শুষ্ক মঙ্গল গ্রহ চিরকাল এইরকম ছিল না এবং বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, এককালে তা আজকের পৃথিবীর মতোই নাতিশীতোষ্ণ ছিল এবং তখন সেখানে জল তরল অবস্থায় ছিল। কাজেই তখন সেখানে অবশ্যই প্রাণের উদ্ভব ঘটেছিল এবং সম্ভবত বহু রকমের এককোষী প্রাণী সেখানে জন্মলাভ করেছিল। এই অনুমানের ভিত্তি হল এই যে, কয়েক বছর আগে বিজ্ঞানীরা আন্টার্কটিকা মহাদেশে একটা উল্কাপিণ্ড খুঁজে পান এবং পরে পরীক্ষা দ্বারা দেখা যায় যে 'এ্যালান হিল-৮৪০০১' নামে পরিচিত ঐ উল্কা পিণ্ডটি মঙ্গল গ্রহ থেকে এসেছিল। সম্ভবত প্রায় ৩০ কোটি বছর আগে একটা বড় ধরনের উল্কাপিণ্ড (মতান্তরে ধূমকেতু) মঙ্গল গ্রহকে আঘাত করে এবং তার ফলে মঙ্গল গ্রহের খানিকটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে মহাকাশে ঘুরতে থাকে। প্রায় ১২০০০ বছর আগে তা আন্টার্কটিকায় পতিত হয়।

এর মধ্যে লক্ষণীয় ব্যাপার হল এই যে, 'নাসা'র বিজ্ঞানীরা দাবি করেন যে, তাঁরা ওই উল্কাপিণ্ডের মধ্যে এমন কিছু জৈব যৌগের সন্ধান পেয়েছেন যা কেবল জীবাণু জাতীয় প্রাণীই তৈরি করতে পারে। এব্যাপারে দ্বিমত থাকলেও কিছু কিছু বিজ্ঞানী মনে করেন যে, আজও সেই জীবাণুরা বেঁচে আছে এবং বাঁচার জন্য মঙ্গলপৃষ্ঠের অনেক নিচে চলে গেছে। এ ধারণা আরও জোরদার হয়েছে এই কারণে যে সম্প্রতি

বিজ্ঞানীরা 'মিথানোকক্কাস জান্নাস্কি' নামে এক প্রকার জীবাণুর সন্ধান পান যা ভূতল পৃষ্ঠের বহু নিচে প্রচণ্ড গরম ও চাপে বেঁচে থাকতে সক্ষম।

১৯৮৯ সালে 'নাসা'র বিজ্ঞানীরা 'গ্যালিলিও' নামে একটি মহাকাশযানকে বৃহস্পতি গ্রহের দিকে পাঠান এবং গত ১৯৯৬ সালের আগস্ট মাসে তা বৃহস্পতির চতুর্থ বৃহত্তম উপগ্রহ 'ইয়োরোপা'কে অতিক্রম করে যায়। ওই সময় 'গ্যালিলিও' যে সব ছবি পাঠায় তা থেকে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, 'ইয়োরোপা'র উপরিভাগ কঠিন বরফের আস্তরণে ঢাকা থাকলেও ওই বরফের নিচে তরল জলের মহাসমুদ্র রয়েছে। কাজেই অনুমান করা চলে যে, ওই মহাসমুদ্রে জীবন বিদ্যমান।

দূর দূরান্তের নক্ষত্রদের কেন্দ্র করে সত্যিই কোন গ্রহ বা গ্রহমণ্ডলী ঘুরছে কিনা তার সন্ধান করতে কিছু জ্যোতির্বিদ ইতিমধ্যে কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছেন। গত ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ক্যালিফোর্নিয়ার 'লিক্' মান মন্দিরের দুই জ্যোতির্বিদ জিয়োফ্রা মার্সি ও পল বাটলার ঘোষণা করলেন যে, তাঁরা একটি গ্রহের খোঁজ পেয়েছেন যা ৩৫ আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্র "47 Ursae Majoris"-কে কেন্দ্র করে ঘুরছে। প্রায় দুমাস পরে তাঁরা আর একটি গ্রহেরও সন্ধান পান, যা 'কন্যা' রাশির অন্তর্গত "70 Virginis" নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। অবশ্য এর কয়েক মাস আগে সুইজারল্যান্ডের জ্যোতির্বিদ্ ডিডিয়ার কুয়েলজ ও মাইকেল মেয়র ঘোষণা করেন যে, তাঁরা একটা গ্রহ আবিষ্কার করেছেন যা ৪৫ আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্র "51 Pegasi"-কে কেন্দ্র করে ঘুরছে। গত বছর অক্টোবর মাসে টেক্সাস ও সানফ্রান্সিস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা যৌথভাবে দাবি করেন যে, তাঁরা বৃহস্পতির থেকে ১.৬ গুণ ভারী ৬ষ্ঠ গ্রহটি আবিষ্কার করেছেন যা "সিগনাস" নক্ষত্রপুঞ্জের "16 Cygni B" নামক নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে ঘুরছে।

এদিকে 'নাসা'র বিজ্ঞানীরা বর্তমান শতাব্দীর মধ্যেই 'অরিজিনস্' নামে একটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র এবং ২০১০ সালের মধ্যে 'প্ল্যানেট ফাইণ্ডার' নামে অপর একটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র মহাকাশে পাঠাবার কথা ঘোষণা করেছে। নাসার অধ্যক্ষ শ্রী ড্যানিয়েল গোল্‌ডিং আশা করেন যে, এই পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে যেসব উন্নত মানের যন্ত্রপাতি থাকবে তার দ্বারা দূরের যেকোন গ্রহের পরিষ্কার ছবি তোলা যাবে। শুধু তাই নয়, ওইসব ছবিতে সেই গ্রহের আকাশের মেঘ, মহাদেশ, মহাসাগর ইত্যাদিও পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাবে। শ্রী গোলডিং এ ব্যাপারে খুবই আশাবাদী যে আর কয়েক বছরের মধ্যেই এটা নিশ্চিত ভাবে প্রমাণ সম্ভব হবে যে বহির্বিশ্বে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কি নেই।

আর একদল বিজ্ঞানী বহির্বিশ্বে বুদ্ধিমান প্রাণী আছে কিনা তার খোঁজ করে চলেছেন। বোস্টন শহরের অদূরে ২৫ মিটার ব্যাস বিশিষ্ট একটি বিশাল 'হারবার্ড স্মিথোনিয়ান' বেতার দূরবীনের সাহায্যে তাঁরা দিনরাত মহাকাশকে পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন। এছাড়াও পৃথিবীতে আরও ১০ থেকে ১২টি কেন্দ্র এই কাজ করে যাচ্ছে এবং সম্প্রতি বৃটেনের 'জডরেল ব্যাঙ্ক' মান মন্দিরের বিজ্ঞানীরাও এই অনুসন্ধান কাজে যোগ দিয়েছেন। তাঁরা এই আশা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন যে, বহির্বিশ্বে যদি কোন বুদ্ধিমান প্রাণী থাকে আর তারা যদি কোন বেতার সংকেত পাঠায় তবে বিশাল বিশাল বেতার দূরবীনের সাহায্যে তাঁরা তা ধরতে পারবেন এবং সম্ভব হলে তার জবাব দিতে পারবেন।

তবে এরকম কোন সংকেত তাঁরা আজ পর্যন্ত পাননি। কিন্তু কথা হল আজ যদি তাঁরা ওইরকম কোন সংকেত পান, তাহলেও এটা প্রমাণ হবে না যে, সেই বুদ্ধিমান প্রাণীরা আজও সেখানে বেঁচে আছে কি না। ধরা যাক, ৩৫ হাজার বছর আলোকবর্ষ দূরের কোন গ্রহ থেকে সেই সংকেত পাওয়া গেল। তাহলে সেই সংকেত ৩৫ হাজার বছর আগে যাত্রা শুরু করেছিল এবং এখন আমরা তার কোন জবাব পাঠালে তাও ৩৫ হাজার বছর পরে সেখানে পৌছুঁবে। তবে এটা অবশ্যই প্রমাণ হবে যে, অন্তত ৩৫ হাজার বছর আগে সেখানে বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব ছিল। এই কারণে বিজ্ঞানীরা সেই সব নক্ষত্রগুলোকেই বেশী গুরুত্ব দিচ্ছেন যাদের দূরত্ব ১০০ আলোকবর্ষের বেশি নয়। তবে বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে খুবই আশাবাদী যে, আর কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁরা বহির্বিশ্বে প্রাণের অস্তিত্ব সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করতে পারবেন।

এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে অস্ট্রেলিয়ার এ্যাডিলেড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ পল ডেভিস বলেন, "বহির্বিশ্বে জীবনের অস্তিত্ব শুধু যে আমাদের বিজ্ঞানকে প্রভাবিত করবে তা নয়, এই আবিষ্কার আমাদের ধর্ম, আমাদের বিশ্বাস এবং সর্বোপরি বিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীকেই পরিবর্তিত করবে।" তিনি আরও বলেন, "বহির্বিশ্বে প্রাণের অস্তিত্ব দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হলে খ্রীস্ট ধর্মমতকে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। আর তা হল, যীশু কি শুধু পার্থিব বুদ্ধিমান প্রাণীরই পরিত্রাতা, নাকি সমগ্র বিশ্বের বুদ্ধিমান প্রাণীরই পরিত্রাতা? এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, শ্রীডেভিস শুধু বুদ্ধিমান প্রাণীর পরিত্রাণ নিয়ে চিন্তিত। তাঁদের ধর্মমত অনুসারে তিনি ঠিকই বলেছেন। কারণ, বুদ্ধিহীন প্রাণীর আত্মাই নেই, তাই তার পরিত্রাণই বা কি আর অ-পরিত্রাণই বা কি। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রীডেভিস আরও একটা মারাত্মক ভুল করে ফেলেছেন। অ-খ্রীস্টান বুদ্ধিমান প্রাণীর পরিত্রাণের ব্যাপারে যীশু বা তাঁর স্বর্গস্থ পিতার

কোন মাথাব্যথা আছে বলে আমাদের জানা নেই। উপরন্তু সেই সমস্ত বিধর্মী নরাধমদের জন্য স্বর্গস্থ পিতা অনন্ত নরকের ব্যবস্থাই করে রেখেছেন। কিন্তু হিন্দুর ভগবান বলে "সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ" অর্থাৎ কেউ আমার প্রিয় নয়, কেউ আমার বিদ্বেষভাজনও নয়। সবাই আমার কাছে সমান (গীতা ৯।২৯)।

কাজেই এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, বহির্বিশ্বে প্রাণের আবিষ্কার খ্রীস্টধর্ম এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সেমিটিক ধর্মমতগুলিরও কবর রচিত করবে। পক্ষান্তরে এই আবিষ্কার হিন্দুর সনাতন ধর্মকে মহিমান্বিত করবে—মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে। হিন্দু ধর্মমতে অব্যয়, অক্ষয় ও সর্বব্যাপী চৈতন্যময় সত্তা ব্রহ্মই হল এই সৃষ্টির আদি কারণ এবং জড় জগৎ, জীব জগৎ সবকিছুই সৃষ্টিকালে এই চৈতন্যময় সত্তা থেকে উদ্ভূত হয় ও প্রলয়কালে সেই চৈতন্যময় সত্তাতেই বিলীন হয়। সনাতন ধর্মমতে জীবন বা প্রাণ সেই চৈতন্যময় সত্তারই একটা বিশেষ প্রকাশ মাত্র। কাজেই হিন্দু সাধক যেদিকে তাকান, জড় জীব সব কিছুতেই সেই এক চৈতন্যময় সত্তাকেই দেখতে পান।

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ।। (গীতা, ৬। ২৯)

কাজেই জীবন যে সর্বব্যাপী, হিন্দুর ভগবান ও হিন্দু ঋষিরা অনেক আগেই তা বলে গেছেন। আজ জড় বিজ্ঞান অনেক কষ্টসাধ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা সেই ঋষিদৃষ্ট সত্যকেই আবিষ্কার করতে চলেছে। আরও আশ্চর্যের কথা হল এই যে, ব্যাসদেব শ্রীমদ্‌ভাগবতে শুধু মনুষ্যবাসযোগ্য অন্য জীবলোকের কথা বলেই ক্ষান্ত থাকেননি, এই ব্রহ্মাণ্ডের মতো আরও কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কথা বলে গেছেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সেই কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু বলে বর্ণনা করে গেছেন।

বিজ্ঞানের বর্তমান আবিষ্কার যে হিন্দু তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শুধু একথা বলা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এই কথা জেনে যাতে প্রতিটি হিন্দুর মনে, নিজের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, অতিশয় উচ্চমানের দর্শন ও ধর্মমতের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জাগরিত হয় এবং অন্তরে গর্ববোধ জাগরিত হয়, সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানকে যদি সাপ বলে মনে করা যায়, তবে অন্যান্য ধর্মমতগুলি হল ব্যাঙ। যারা সাপের কাছ থেকে দূরে পালাতে ব্যস্ত। তা না হলে সাপ তাদের খেয়ে হজম করে ফেলবে। সেখানে হিন্দু ধর্ম হল অভিজ্ঞ সাপুড়ে, যে নিমেষে ওই সাপকে ধরে ঝাঁপিতে পুরে ফেলতে সক্ষম। প্রতিটি হিন্দুকে মনে রাখতে হবে যে অনেক জন্মের পুণ্য ফলে হিন্দু হয়ে জন্মেছি এবং এক সুউন্নত ঐতিহ্যের অধিকারী হয়েছি।

একমাত্র হিন্দুসংস্কৃতিই ধ্বংসোন্মুখ পাশ্চাত্য সমাজকে রক্ষা করতে সক্ষম

একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, বর্তমানে আমরা মানব ইতিহাসের একটা মতিচ্ছন্ন পর্যায় অতিক্রম করে চলেছি। একদিকে আমরা, প্রাচ্যের বাসিন্দারা, আধুনিক হবার জন্য অন্ধ ভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করে চলেছি, আর অপরদিকে পাশ্চাত্য তার আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার করাল গ্রাস থেকে নিজেকে উদ্ধার করার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সবথেকে দুঃখের ব্যাপার হল এই যে, গ্লোবালাইজেশনের নামে পাশ্চাত্য মূলধন, কারিগরি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ভোগবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্য আমরা দরজা খুলে দিয়েছি। কিন্তু একবারও চিন্তা করছি না যে, এই যান্ত্রিক ও ভোগবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতা তাদের নিজেদের দেশে সমাজ ব্যবস্থার মূল বুনিয়াদকেই ধ্বংস করে দিয়েছে এবং চিরন্তন মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধকে ধুলায় মিশিয়ে দিয়ে সমস্ত সমাজ ব্যবস্থাকেই পতনোন্মুখ করে তুলেছে।

পাশ্চাত্যের এই যান্ত্রিক সভ্যতা সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এতটা বাড়িয়ে তুলেছে যে আজ আমেরিকার শতকরা ২৫টি পরিবারের সদস্য সংখ্যা মাত্র একজন। বর্তমানে সেখানকার মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৫ জন মানসিক রোগের শিকার এবং প্রতি দশ বছরে এই সংখ্যা দ্বিগুণ হচ্ছে। খুন ও পথ দুর্ঘটনার পর আত্মহত্যাই সেখানে মৃত্যুর তৃতীয় মূল কারণ। খুনখারাপির ফলে ১৯৯৬ সালে সেখানে প্রায় ৪০,০০০ লোক মারা যায় এবং জনসাধারণকে এই ভয়াবহতা সম্বন্ধে সচেতন করার জন্য মৃত ঐ চল্লিশ হাজার লোকের চল্লিশ হাজার জোড়া জুতো রাজধানী ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউসের সামনে সাজিয়ে রাখা হয়। একটা সমীক্ষায় দেখা যায় যে, গড়ে প্রতি ১৬ মিনিটে একজন আমেরিকান বন্দুকের গুলিতে প্রাণ হারায়। সেখানে প্রতি ১০০০ বিবাহের মধ্যে ৫৩৮টি বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটছে এবং স্কুলের অবিবাহিত মেয়েরা শতকরা ২৫টি বাচ্চার জন্ম দিচ্ছে। এব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে একজন মার্কিন সাংবাদিক বলছেন, "It is really amazing to see a twelve year old school girl to carry her second baby.".

বিবর্তনবাদী মনস্তত্ত্ববিদ্ নামে পরিচিত কিছু বিজ্ঞানী উপরিউক্ত সামাজিক ব্যাধিগুলোর কারণ অনুসন্ধান করতে নেমে পড়েছেন। এইসকল বিজ্ঞানীদের মতে উপরিউক্ত সামাজিক ব্যাধিগুলোর মূল কারণ হল, যে পরিবেশের মধ্যে মানুষের উদ্ভব

হয়েছিল আর আজ যে পরিবেশে তারা বাস করতে বাধ্য হচ্ছে, এই দুই পরিবেশের মধ্যেকার দুস্তর ব্যবধান। বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতা পরিবেশকে অনেকদিন থেকেই কলুষিত করছে। তবে সবথেকে প্রধান হল এই যে, এই সভ্যতা মানুষে মানুষে মৈত্রী, ভালবাসা, সহমর্মিতা ইত্যাদিকে নষ্ট করে বিচ্ছেদের প্রাচীর খাড়া করে তুলেছে।

আজও পৃথিবীতে কিছু কিছু জনবসতি আছে যাদের মধ্যে এখনও তথাকথিত সভ্যতার অনুপ্রবেশ ঘটেনি। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের জারোয়া প্রজাতির লোকেরা এর প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এছাড়া জাপানের 'আইনু' দক্ষিণ আফ্রিকার 'কুংসান' এবং দক্ষিণ আমেরিকার 'এক' জাতির লোকেরা এই পর্যায়ে পড়ে। এরা মূলতঃ শিকারের দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এছাড়া আরও কিছু কিছু জাতির লোকেরা চাষবাস করলেও, সেই হাজার হাজার বছর আগে যেমন ছিল আজও তেমনিই রয়ে গেছে। বিজ্ঞানীরা এই সমস্ত শিকারী ও কৃষিজীবী মানুষদের মধ্যে পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে তাদের মধ্যে মানসিক রোগ বলতে কিছু নেই। মানসিক রোগীদের রক্তে 'কর্টিসল' নামে একটি যৌগ পাওয়া যায়। কিন্তু এই সমস্ত জাতির লোকেদের রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, কর্টিসল একেবারেই নেই।

এইসমস্ত আদিম প্রজাতির মানুষদের মধ্যে যেটা খুব স্পষ্ট করে চোখে পড়ে তা হল, তাদের সবাই সবাইকে চেনে, জানে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পাড়াপ্রতিবেশীদের সঙ্গে বছরের পর বছর একসঙ্গে থাকতে থাকতে নিজেদের মধ্যে একটা নিবিড় আত্মীয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমাদের দেশেও পাশ্চাত্য শিল্প সভ্যতার ততটা অনুপ্রবেশ এখনও ঘটেনি বলে আমাদের পাড়াগাঁয়ে গেলেও ঠিক এমনই একটা পরিবেশ সহজেই চোখে পড়ে। এদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের প্রায় রোজই দেখা-সাক্ষাৎ হয়। কাজেই কোন কারণে ঝগড়া বা মনোমালিন্য হলে তা সহজেই মিটে যায়। কিন্তু শহরের মানুষকে সভ্যতা এতখানি বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে যে দেখা যায়, এই ফ্ল্যাটে কি ঘটছে পাশের ফ্ল্যাটের লোক তা জানতে পারে না। কাজেই তাদের মধ্যে কোন মনোমালিন্য ঘটলে তা আর মিটবার সুযোগ পায় না।

বিজ্ঞানীদের মতে, বর্তমান ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার সূত্রপাতের সময় থেকেই পুরাণো পারিবারিক ও সামাজিক পরিকাঠামোর ভাঙন শুরু হয়েছে। প্রথমতঃ, গ্রামের চাষীদের শহরের শিল্প শ্রমিকে পরিণত করার মধ্যে দিয়ে তা শুরু হয় এবং বর্তমানে বিভিন্ন পেশার; বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ কর্মদক্ষতা সম্পন্ন লোককে তাদের আত্মীয়-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবের বেষ্টনী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূর দূরান্তে চালান করার মধ্য দিয়ে

সেই প্রক্রিয়া কাজ করে চলেছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, স্বাভাবিক ভাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই বিশ্বাস, বদান্যতা, কৃতজ্ঞতা, বন্ধুত্ব ভালবাসা ইত্যাদি কোমল প্রবৃত্তিগুলো বর্তমান থাকে। কিন্তু বর্তমান সভ্যতা মানুষকে পরিচিত গণ্ডী থেকে বিচ্ছিন্ন করে মানব মনের এই কোমল দিকগুলোকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলেছে। মানুষকে অসামাজিক, স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক করে তুলছে।

সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও একাকীত্ব তৈরি করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা টেলিভিসনকে আর একটি মোক্ষম কারণ বলে মনে করেন। যদি সেই টিভিকে কেবল্ বা ভিসি আর-এর সঙ্গে যুক্ত করার ব্যবস্থা থাকে, তবে ফল হয় আরও মারাত্মক। বিবর্তনবাদী মনস্তত্ত্ববিদ ডঃ রুডলফ্ নেসে-এর মতে টিভির আরও একটা ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর দিক আছে। তিনি মনে করেন যে, টিভিতে যেসব কাল্পনিক লোকজন এবং তাদের কাল্পনিক জীবনযাত্রা ও আর্থিক স্বচ্ছলতা দেখানো হয়, তা দর্শকের মনে নিজের প্রতি হীনম্মন্যতা সৃষ্টি করে। শুধু তাই নয়, সে তার আত্মীয়, বন্ধু ও পারিপার্শ্বিক লোকজনকেও টিভিতে দেখানো লোকজনের চাইতে হীন ভাবতে শুরু করে। এছাড়া টিভি যে মানুষের মনে অপরাধ-প্রবণতা বাড়িয়ে তোলে তা বলাই বাহুল্য। একটা সমীক্ষায় দেখা গেছে যে পঞ্চাশের দশকে যখন আমেরিকায় প্রথম টিভি চালু হয়েছিল, তখন যে যে শহরে টিভি চালু হয় সেই সেই শহরে চুরি, রাহাজানি ইত্যাদি ঘটনা হঠাৎই বেড়ে যায়।

গত ১৯৯৬ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের স্ত্রী হিলারী ক্লিনটন আমেরিকার বাচ্চাদের সমস্যা নিয়ে একটা বই লিখে বেশ হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিলেন। তাতে তিনি নানাভাবে, উদাহরণ সহযোগে দেখিয়েছেন যে, টিভি কিভাবে শিশুমনকেও কদর্য ও অপরাধপ্রবণ করে তুলতে সাহায্য করে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ রবার্ট পুটনামের মতে, টিভি সমষ্টিগত রুচিকে প্রাধান্য না দিয়ে শুধু ব্যক্তিগত রুচিকেই প্রাধান্য দেয়। বিজ্ঞানীদের মতে টেলিফোন, সেলুলার ফোন এবং অধুনা 'ইন্টারনেট' ও তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সামাজিক বিচ্ছিন্নতা তৈরি করে চলেছে।

বিবর্তনবাদী মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা এটাও লক্ষ্য করেছেন যে, বর্তমান শহুরে সভ্যতার বিচ্ছিন্নতা শিশুকে বড় করে তোলার কাজকে একা এক মায়ের পক্ষে দুঃসাধ্য কার্যে পরিণত করেছে। অথচ গ্রাম্য বা আদিম পরিবেশ বা সমাজে শিশু মানুষ করার কাজটা খুবই সহজ ব্যাপার। আত্মীয়-স্বজন ও পাড়াপ্রতিবেশীরা এই দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেয় বলে একা মায়ের ওপর সমস্ত দায়দায়িত্ব এসে চেপে বসে না। এইসব গ্রাম্য বা আদিম সমাজে একটা দৃশ্য খুবই চোখে পড়ে। তা হল কোন মহিলা তার প্রতিবেশীর

বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন। অথচ আজকের সভ্য সমাজে এরকম একটা দৃশ্য শুধু বিরলই নয়, কল্পনার বাইরে।

ফিলিপ ওয়াকার নামে একজন নৃতত্ত্ববিদ্ প্রায় ৫০০০ শিশুর কঙ্কাল পরীক্ষা করেছেন যার মধ্যে খ্রীস্টপূর্ব ৪০০০ বছরের সময়কার পুরাণো কঙ্কালও রয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই যে, ওই সমস্ত কঙ্কালের হাড়ে শ্রী ওয়াকার কোন আঘাতের চিহ্ন পাননি। অথচ বর্তমান কালের ২০টি ওইরকম কঙ্কাল পরীক্ষা করলে অন্ততপক্ষে একটার মধ্যে জখমের চিহ্ন পাওয়া যাবে। নৃতত্ত্ববিদ্দের মতে আগেকার শিশুরা মা, মাসী, পিসী, কাকা, জ্যাঠা, ঠাকুমা, দিদিমা ইত্যাদির চোখের সামনে বড় হত বলে আঘাত পাবার সম্ভাবনা থাকত না। নৃতত্ত্ববিদ মার্টিন ড্যালী, মার্গো উইলসন প্রভৃতির মতে, বর্তমানে শিশু নির্যাতনের ঘটনা বেড়ে চলেছে এবং সেই কারণেই আঘাতের সম্ভাবনা বেড়ে যাচ্ছে। বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে শিশুরা শুধু দৈহিক এবং মানসিকই নয়, যৌন নির্যাতনেরও শিকার হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, যেসব শিশু জন্মদাতা পিতার বদলে সৎ পিতার আশ্রয়ে থাকতে বাধ্য হয়, তারা অনেক বেশি মাত্রায় নির্যাতনের শিকার হয়। এই কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনা যত বাড়ছে শিশু নির্যাতনের মাত্রাও তত বাড়ছে।

কিছুদিন আগে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ১৯৫৭ ও ১৯৯০ সালের মধ্যে আমেরিকানদের গড় মাথাপিছু আয় দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে। অথচ আমি খুব সুখে আছি—একথা বলার মতো লোকের সংখ্যা মোটেও বাড়েনি। ১৯৫৭ সালে এরকম লোকের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ এবং ১৯৯০ সালেও তাই-ই আছে। এ থেকে মনস্তত্ত্ববিদ্রা মনে করেন যে শুধু ভোগের সামগ্রী বাড়ালেই মানুষের সুখ বাড়ে না। ডেভিড মায়ার নামে একজন মনস্তত্ত্ববিদ্ তাঁর ''The Persuit of Happiness'' গ্রন্থে লিখেছেন, ''More domestic products is not the answer to our deepest needs'' অর্থাৎ শুধু ভোগ্যপণ্যই আমাদের অন্তরের প্রয়োজনের একমাত্র সমাধান নয়। বিবর্তনবাদী মনস্তত্ত্ববিদ্ শ্রীমতী টিমথী মিলার মনে করেন যে, মানুষ সব সময় নিজেকে তুলনা করে প্রতিবেশী ও তার সহকর্মীদের সঙ্গে। কাজেই সে যদি দেখতে পায় যে তার প্রতিবেশীরা বা সহকর্মীরা রাতারাতি ধনী হচ্ছে না বা প্রাচুর্য দেখাচ্ছে না, তবে সেও নিজের যা কিছু আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থেকে যাবে।

বিজ্ঞানী শ্রীডেভিড মায়ার মনে করেন যে, সব মানুষই একটু বেশি পেতে চায়। আজকের ধনতান্ত্রিক শিল্প সভ্যতা বিজ্ঞাপন ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের মনে ওই একটু বেশি পাবার বাসনাকে নিরন্তর বাড়িয়ে চলেছে। অপরদিকে, ওই একটু বেশি পাবার

বাসনা মানুষে মানুষে একটা প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে তুলছে। সবাই তার প্রতিবেশীকে দেখাতে ব্যস্ত যে, দেখ এটা আমার আছে, তোমার নেই। কাজেই আমার স্ট্যাটাস তোমারথেকে ওপরে। এই প্রতিযোগিতা প্রতিবেশীর সঙ্গে বন্ধুত্ব ও প্রীতিপূর্ণ মনোভাবের বদলে হিংসা, ক্ষোভ, হীনম্মন্যতা ইত্যাদির জন্ম দিচ্ছে এবং পক্ষান্তরে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করছে।

বিজ্ঞানী মায়ার, মিলার ও অন্যান্যদের মতে, আত্মসংযমই হল একমাত্র পথ, যার দ্বারা মানুষ নিজেকে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত করতে পারে। একমাত্র আত্মসংযমই পারে বিজ্ঞাপনের দ্বারা সৃষ্ট প্রলোভনকে দমন করতে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীর সঙ্গে স্ট্যাটাস-এর প্রতিযোগিতাকে রুখতে। ভারতবর্ষের মানুষের কাছে আত্মসংযমের কথা কোন নতুন কথা নয়। কারণ, হিন্দু সংস্কৃতির মূল বুনিয়াদই হল, ত্যাগ আর আত্মসংযম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন—

আপূর্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে স
শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী।। (২।৭০)

অর্থাৎ যেমন বিভিন্ন নদনদীর জল পরিপূর্ণ অচল, স্থির সমুদ্রে পতিত হয়ে তাকে বিচলিত না করেই মিশে যায়, বিলীন হয়ে যায়, তেমনি সমস্ত বিষয় ভোগ বাসনাও যে ব্যক্তির মনে কোন বিকার সৃষ্টি না করে বিলীন হয় তিনিই পরম শান্তি লাভ করেন। কিন্তু বিষয়ভোগ আকাঙ্ক্ষাকারীর শান্তিলাভ অসম্ভব।

কিন্তু পাশ্চাত্য মতে মানুষ সমাজবদ্ধ পশু মাত্র। তাই তাদের তত্ত্বে ভোগবাদের প্রাধান্য। আত্মসংযমের বিন্দুমাত্র স্থান তাতে নেই। উপরন্তু মনস্তাত্ত্বিক ডাঃ ফ্রয়েড-এর মতে মানুষ হল যৌন কামনার দ্বারা বশীভূত ও যৌন কামনার দ্বারা তাড়িত পশু। ফ্রয়েড সাহেব আদিম মানব সমাজকে যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তা আরও ভয়াবহ। তাঁর মতে তারা যূথবদ্ধভাবে বাস করতো এবং সেই যূথের নারীদের ওপর প্রভুত্ব করার জন্য পুরুষদের মধ্যে সর্বদাই মারামারি লেগে থাকতো। তারপর একদিন যূথকর্তা বৃদ্ধ হলে তার ছেলেরাই তাকে মেরে তার মাংস খেয়ে ফেলত ও নারীদের উপর প্রভুত্ব অর্জন করতো।

কিন্তু সেই পাশ্চাত্যের মনোবিজ্ঞানীরাই আজ অন্য কথা বলছেন। তাঁরা বলছেন যে, এতদিন তাঁরা আদিম মানব সমাজকে কামনা-তাড়িত উচ্ছৃঙ্খল বলে যেমন ভেবে এসেছেন, তা ঠিক নয়। সেই আদিম মানবদের মধ্যেও দয়া, মায়া, সহানুভূতি, প্রেম, ভালবাসা ইত্যাদি কোমল মানবিক দিকগুলোও আজকের মতোই বর্তমান ছিল এবং

সেই কারণে সহজাত অপরাধবোধ তাদের মধ্যে আত্মসংযমের কাজ করতো। আজকের যে সমস্ত মানব সমাজে তথাকথিত সভ্যতার অনুপ্রবেশ ঘটেনি, বিজ্ঞানীরা আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন যে, সেই সমস্ত সমাজেও সহজাত অপরাধবোধ থেকে আত্মসংযম জন্মলাভ করছে।

গত ১৯৯৬ সালে বিশ্ববিখ্যাত সাপ্তাহিক 'টাইম' পত্রিকায় শ্রীল্যান্স মোরো নামে একজন স্বনামধন্য লেখক একটি প্রবন্ধ লিখলেন যার শিরোনাম হল, ''Fifteen Cheers for Abstinence'' বা আত্মসংযমের উদ্দেশ্যে পনেরোটি সাধুবাদ। ওই প্রবন্ধে তিনি লিখলেন, পাশ্চাত্য সভ্যতার যেসব ব্যাধিগুলো আজ প্রবলভাবে দেখা দিচ্ছে, যেমন— এইড্স্, মাদক দ্রব্য সেবন, নাবালিকাদের গর্ভধারণ, পথ দুর্ঘটনা ইত্যাদির একমাত্র প্রতিবিধান আত্মসংযম। তিনি আরও লিখেছেন, শুধু আত্মসংযমের কথা বলে ক্ষান্ত হলে চলবে না, সমাজের প্রতিটি স্তরে তার অনুপ্রবেশ ঘটাতে হবে এবং সর্বোপরি শিশু বয়স থেকেই সবাইকে বোঝাতে হবে যে, যে যত সংযমী হবে, সেই তত লাভবান হবে। এইভাবে ক্রমে ক্রমে আত্মসংযমের একটা সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে।

বিস্ময়ের ব্যাপার হল এই যে, শ্রীমোরো সাহেব যা বলতে চেয়েছেন তা হল, নির্ভেজাল হিন্দু সংস্কৃতি। আমাদের মুনি-ঋষিরা হাজার হাজার বছর আগে যা বলে গেছেন, আজ পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সেই সত্যকেই উপলব্ধি করছে এবং অনুসরণ করার কথা বলছে। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস-এর মধ্য দিয়ে আমাদের ঋষিরা যে জীবনযাত্রার পথ দেখিয়ে গিয়েছেন, অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ভোগবাদী পাশ্চাত্যও সেই সত্যদৃষ্ট ঋষিবাক্য মাথায় তুলে নিতে বাধ্য হচ্ছে, ঋষিদৃষ্ট পথ অনুসরণ করতে বাধ্য হচ্ছে। ষাটের দশকে যেই আমেরিকা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের যৌনশিক্ষা আবশ্যিক পাঠ্যবিষয় করেছিল, আজ সেই আমেরিকাই বলছে যে, যৌনশিক্ষার বদলে তাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক শিক্ষা চালু করতে হবে এবং আত্মসংযম ও ব্রহ্মচর্যের শিক্ষা দিতে হবে। সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনের বলে যে আমেরিকায় এতদিন যে কেউ ইচ্ছা করলেই আগ্নেয়াস্ত্রের মালিক হতে পারত, আজ সেই দ্বিতীয় সংশোধনের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হচ্ছে। যে আমেরিকা এতদিন ভাবতো যে শুধু পুলিশ ও প্রশাসনের দ্বারাই অপরাধ দমন করা সম্ভব, সেই আমেরিকাই আজ অপরাধীদের মধ্যে আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রচারের কথা ভাবছে। এ প্রসঙ্গে স্বামীজীর একটি উক্তি দিয়ে এই প্রবন্ধের সমাপ্তি ঘটানোটাই সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত হবে। তিনি বলেছিলেন, ''আমাদের ঋষিরা কতটা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন তাহা অনুধাবন করিতে পাশ্চাত্যের এখনও কয়েক শত বৎসর লাগিবে।''

বিষয়-সূচী

লেখকের অন্যান্য বই ঃ

★ FALSEHOOD SHROUDS
THE TRUE HISTORY OF DELHI AND AGRA
Price : ₹ 150.00

★ নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন (১)
মূল্য ঃ ১০০.০০

★ নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন (২)
মূল্য ঃ ১০০.০০

★ পুরুষার্থ প্রসঙ্গ ঃ পাশ্চাত্য বনাম
ভারতীয় ভাবধারা— মূল্য ঃ ৫০.০০

★ মিথ্যার আবরণে দিল্লী, আগ্রা,
ফতেপুর সিক্রি— মূল্য ঃ ৫০.০০

★ মার্কস ও মার্কসবাদীদের অজ্ঞতা
মূল্য ঃ ৩০.০০

★ এক নজরে ইসলাম— মূল্য ঃ ৩০.০০

★ কল্যব্দ ঃ সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ভিত্তিক
হিন্দু কালগণনা— মূল্য ঃ ২৫.০০

★ **Three Decrees of Islam**
Rs. 25.00

★ ইসলামকে তিন সিদ্ধান্ত (হি)
মূল্য ঃ ২০.০০

★ ভারতীয় ঐতিহ্য ও গান্ধীবাদী অহিংসা
মূল্য ঃ ২০.০০

★ স্কুলে যৌনশিক্ষা ঃ একটি গভীর চক্রান্ত
মূল্য ঃ ১০.০০

★ ইসলামের তিন সিদ্ধান্ত
মূল্য ঃ ৫.০০